কিশোর ভারতী

পঞ্চম বর্ষ • নবম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ • জুন ১৯৭৩
সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

ছোট ছোট বাসন কোসন
চামচ হাঁড়ি-কুড়ি
'ডাটার' গুঁড়ো মশলা দিয়ে
রান্না ভালই করি।

ডাটা
গুঁড়া মশলা

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকৃমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭,মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড,কলিকাতা-৭

● পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক জেলা-বোর্ডসমূহের জন্য মাসিক কিশোর-পত্রিকারূপে অনুমোদিত। [১৫.৩.৭৩ তারিখের ১০৯ (১৬) টিবিসি / ২বি-২০জি/৭১ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।]

● পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [১৭.৩.৭২ তারিখের টি. বি. নং ৩ দ্রষ্টব্য।]

● আসাম শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [২.৭.৭১ তারিখের ই জি/এম আই এস সি/২৩/৭০/৩২ /(এ) নং মেমো দ্রষ্টব্য।]

● পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহের ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫.৯.৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।]

'পত্র ভারতী'র প্রকাশনায়

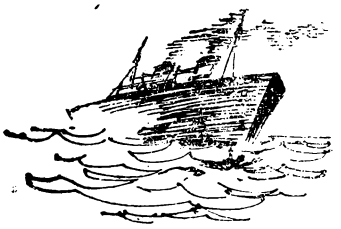

কিশোর ভারতী

পঞ্চম বর্ষ : : নবম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ ॥ জুন ১৯৭৩

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
দেশটাকে পেঁচোয় পেয়েছে ৬৪৫

ইতিহাস-নির্ভর অসাধারণ ধারাবাহিক উপন্যাস
সাদা ঘোড়ার সওয়ার—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬৭০

উপন্যাসোপম বড় সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার
প্রতিহিংসা—ময়ূখ চৌধুরী ৬৭৬

উপন্যাসোপম বড় ভ্রমণ-কাহিনী
নেপালের পথে ও নগরে—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৬৫৪

বনে যারা থাকে
টেংনীর চিতাবাঘ—সঙ্কর্ষণ রায় ৬৪৮

মিষ্টি গল্প
চেঞ্জ—অজেয় রায় ৬৮৫

জীবজগতের গল্প
বৃশ্চিক—অবনীভূষণ ঘোষ ৬৮৩

মহাজীবনের গল্প
বিজ্ঞানের যাদুকর—সুনীলাংশু দাশ ৬৯৪

সামাজিক গল্প [সিপ্রা বিশ্বাস-স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত]
মায়ের মত আর কে আছে?—অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় ৬৯৭

কবিতাগুচ্ছ
কি বিপদ!!—প্রদীপকুমার রায় ৬৬৪
নীল পরী—গোবিন্দ গোস্বামী ৬৬৪
ছড়া—করুণাময় বসু ৬৬৫
কিশোর—শৈলেন দত্ত ... ৬৬৫
আমার ছড়া—প্রবাস দত্ত ৬৬৫
মিল-অমিল—শৈবাল চক্রবর্তী ৬৬৫
হিজিবিজি—তপনকুমার চৌধুরী ৬৬৫

ব্যায়াম
এই আধারে—মঞ্জিল সেন ৭১৩
সঙ্গীত
কোন্ নূপুরে?—সুরান্বেষী ৭০৫
ধাঁধা-হেঁয়ালি—পরিচালকঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
শব্দ-ছক ৭০১
গত এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ৭০২
বিজ্ঞানীর দপ্তর—পরিচালকঃ কিশোর বিজ্ঞানী
নিজে করো—সুশান্ত দত্ত ... ৭০৩
বিজ্ঞান-বিচিত্রাঃ
মশা মারতে মিনো—সিতাংশুবিমল করঞ্জাই ৭০৩
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবদান—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭০৩
বিড়ালের স্বভাব—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭০৪
হাড় ভাঙলে ভয় নেই—সমরেন্দ্র মণ্ডল ৭০৪
বইয়ের দুনিয়া—পরিচালকঃ নিরাপদ রায়
পুস্তক-সমালোচনা বিভাগ ৭১২
বরণীয় চরিত্রের স্মরণীয় ঘটনা
মহাজীবনের মণিকণা—শৈলেনকুমার দত্ত ৭১৭
খেলাধুলাঃ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
ভয় থেকে ভয়ংকর ৭০৯
স্বপন আর সুকল্যাণের চোখে ৭১০
বিজয় জীবনের সেরা খেলা খেলেছিলেন ৭১০
স্মরণীয় যাঁরা ৭১১

চন্দন সৌরভে সুরভিত হয়ে থাকুন

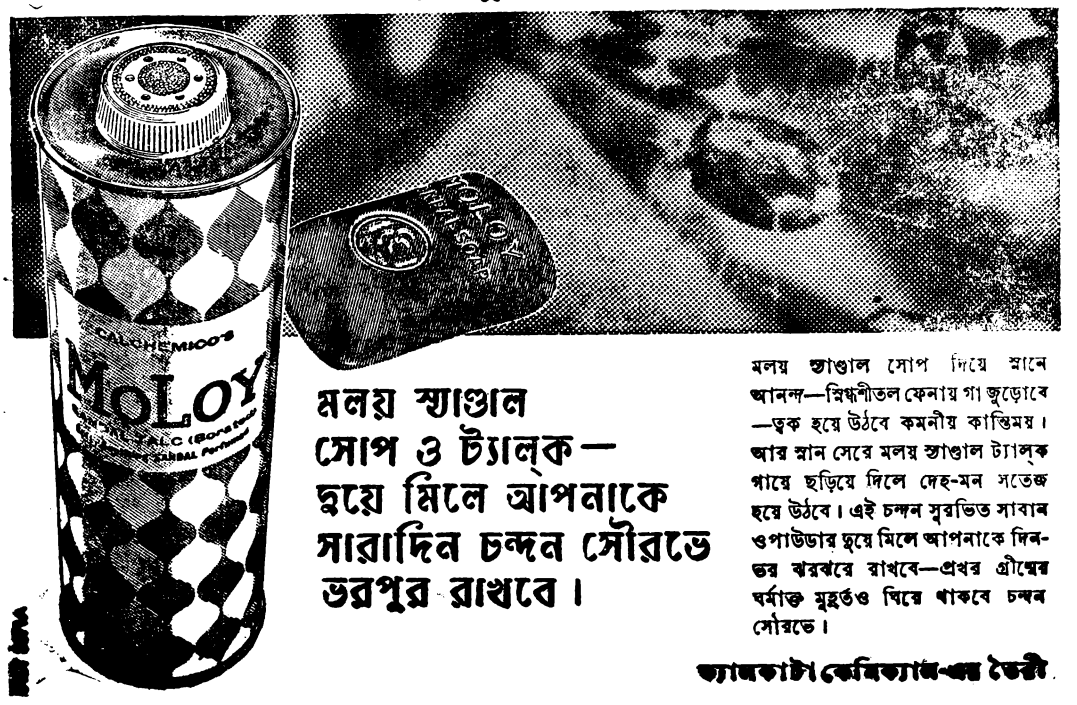

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ ও ট্যাল্‌ক—
দুয়ে মিলে আপনাকে
সারাদিন চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে।

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ দিয়ে স্নানে আনন্দ—স্নিগ্ধশীতল ফেনায় গা জুড়োবে—ত্বক হয়ে উঠবে কমনীয় কান্তিময়। আর স্নান সেরে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক গায়ে ছড়িয়ে দিলে দেহ-মন সতেজ হয়ে উঠবে। এই চন্দন সুরভিত সাবান ও পাউডার দুয়ে মিলে আপনাকে দিনভর ঝরঝরে রাখবে—প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তও ঘিরে থাকবে চন্দন সৌরভে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

বিবিধ
আসন্ন ষষ্ঠ বর্ষের গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ৬৪৪
সওয়াল-জবাবঃ বাণী মৌলিক
প্রশ্নোত্তর-বিভাগ ৭১৯
চিত্রে ধারাবাহিক কাহিনী ● রহস্যমণ্ডিত অতীতের
সংখ্যার নাম চার—ময়ূখ চৌধুরী ... ৬৯২
চিত্রে প্রতি সংখ্যায় সম্পূর্ণ কাহিনী ● কৌতুক-সরস কৌতূহলের
অধ্যাপক ত্রিবেদী ও কালো বিড়াল ... ৬৬৬
প্রচ্ছদ
ওরা কাজ করে—সূর্য রায়

মূল্য ঃ এক টাকা

।। প্রাপ্তিস্থান ।।

কিশোর ভারতী কার্যালয় ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
ডিএনবিএ ব্রাদার্স ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

'পত্র ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

★ আসন্ন ষষ্ঠ বর্ষের (আশ্বিন ১৩৮০ বা অক্টোবর ১৯৭৩ থেকে ভাদ্র ১৩৮১ বা সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত) গ্রাহক-গ্রাহিকা হবার নিয়মাবলী ★

১. আসছে বৎসর থেকে বারো মাসে কিশোর ভারতীর তেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হবেঃ একটি বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যা ও বারোটি সাধারণ সংখ্যা।

২. সাধারণ সংখ্যাগুলির মূল্য প্রতি কপি এক টাকা ও বিশেষ সংখ্যা আনুমানিক আট টাকা।

৩. গ্রাহক চাঁদা দুই রকমঃ

(ক) যাঁরা তেরটি সংখ্যাই পেতে চান তাঁদের বার্ষিক চাঁদা লাগবে ষোল টাকা। বিশেষ বা সাধারণ—কোন সংখ্যার জন্যই তাঁদের ডাক-ব্যয় দিতে হবে না।

(খ) যাঁরা বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যাটি বাদে বাদবাকি বারোটি সংখ্যা পেতে চান, বার্ষিক চাঁদা হিসাবে তাঁদের দিতে হবে এগারো টাকা। সাধারণ সংখ্যাগুলির জন্য তাঁদের ডাক-ব্যয় দিতে হবে না।

৪. বর্ষের প্রথম (আশ্বিন ১৩৮০ বা অক্টোবর ১৯৭৩) সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে হয়—যে কোন সংখ্যা থেকে নয়।

৫. সম্ভাব্য গ্রাহক-গ্রাহিকাকে কোন আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে না। মানি অর্ডার করে চাঁদা পাঠালে **মানি অর্ডার কুপনে সম্ভাব্য গ্রাহক-গ্রাহিকা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অতি অবশ্যই উল্লেখ করবেনঃ** গ্রাহকের নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, কতগুলি সংখ্যার (তেরটি, না বারোটি) জন্যে চাঁদা পাঠাচ্ছেন এবং বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যা (অবশ্য যদি তিনি বিশেষ সংখ্যাসহ গ্রাহক হতে চান) ও সাধারণ সংখ্যাগুলি তিনি কিভাবে (হাতে, না ডাকে) সংগ্রহ করতে চান।

৬. চাঁদার টাকা (রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) যে কোন দিন বেলা বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়া যায়। **সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই চাঁদার রসিদ নিতে হবে।** শনিবার চাঁদা দেবার সময় বেলা এগারোটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত।

৭. একবারে এক বছরের কম বা বেশী গ্রাহক হওয়া যায় না।

৮. পুরনো গ্রাহক-গ্রাহিকারা চাঁদা জমা দেবার সময় অবশ্যই তাঁদের সঠিক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

৯. গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম একসঙ্গে জমা দিতে হবে।

১০. **ষষ্ঠ বর্ষের জন্য গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ১৯৭৩ সালের ৩১শে আগস্ট।**

কর্মাধ্যক্ষ, পত্র ভারতী ...
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
ফোন নং ৩৪-৩১৫৭

দেশটাকে পেঁচোয় পেয়েছে

স্নেহের বন্ধুগণ,—কি হলো বলো তো? দেশটাকে যে আগাগোড়া পেঁচোয় পেল! তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সবই যে গেল পেঁচোর পেটে!

ও কি! অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন? অ্যাঁ, পেঁচোকে চেন না? 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে যে একটা কথা আছে শোননি? বাচ্চা ছেলেমেয়ের খেঁচুনি বা ধনুষ্টংকার রোগ হলে গাঁয়ের লোককে বলতে শোননি, 'বাচ্চাটাকে পেঁচোয় পেয়েছে'? তার মানে, পেঁচো বাচ্চাটার ঘাড়ে চেপেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, পেঁচোকে আমার কোন দিনই পছন্দ হয় না। আগে আমলও দিতাম না। আমার চিরকেলে ধারণা ছিল, ওটা এক্কেবারেই বাজে যা তা—যাকে বলে ছিঁচকে পাতি ভূত। বয়স্কদের কাছে ঘেঁষতে ওর সাহস নেই, তাই গোবেচারা বাচ্চাদের ওপর ওর যত হামলা!

কিন্তু আমার এ ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। চোখের সামনে দিনের পর দিন মানুষ-অমানুষ নির্বিশেষে ধাড়ী-বাচ্চা সমেত গোটা দেশটাকে ধাপে ধাপে পেঁচোয় পেতে দেখলে, ভুলের আর দোষ কি বলো? না ভেঙে ও আস্ত থাকতে পারে কখনো? তাই ভেঙেছে। আজ আমার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, পেঁচোর ক্ষমতা অসীম—অন্য যে 'বারো ভূতে'র কথা আমরা শুনি, সেসব ভূতের চেয়ে অনেক-অনেক বেশী।

'গোটা দেশটা' বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি, বুঝতে পারছো? বোঝাচ্ছি এই পুরো ভারতীয় উপমহাদেশকে, অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে একত্রে, আগে এক কথায় যাকে বলা হতো 'ভারতবর্ষ'। সদাশয় ইংরেজ সরকারের দৌলতে প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে এই 'ভারতবর্ষ'-এর বরাতে কি দশা ঘটেছিল, তা বোধ করি তোমাদের আর নতুন করে বলার দরকার নেই—স্কুলপাঠ্য ইতিহাস-ভূগোলের বই থেকে সে সম্বন্ধে তোমরা নির্ঘাৎ খাঁটী মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেছ। আজ 'ভারতবর্ষ' নেই, আছে ভারতীয় উপমহাদেশ। যদি চাও তো, তোমরা আগামী ১৪ই অগাস্ট সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরলোকগত 'ভারতবর্ষ'-এর ষড়্‌বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালন করতে পার।

যাক্, যা বলতে চাইছিলাম—ধান ভানতে মহীপালের গীত মূলতুবী রেখে বলি, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে এই যে ভারতীয় উপমহাদেশ, তাকে পেঁচোয় পেয়েছে। কিন্তু আজ নয়, সেই প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে ভারতবর্ষকে কেটে ফেড়ে চিরে যেদিন স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখনই। বুঝতেই পারছো—সেই জন্মলগ্নে দেশ দুটো, নেহাৎ বাচ্চা কিনা, তাই ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। আর ইংরেজের মহত্ত্বতে সারা উপমহাদেশ জুড়ে থই থই করছে রক্ত। কী রক্ত! সে কী রক্ত! আর পেঁচোর সে কী ফূর্তি! তখনই সে দেশ দুটোকে ধরলো। আর সেই থেকে তাদের ঘাড়ে জেঁকে বসে সে সমানে রক্ত খেয়ে চলেছে। তাই তো দেশগুলোর আজ এই দশা—রিকেটী চিমসে চেহারা, ঢাকের মতো পেট, হাত-পা টিংটিং, ফ্যাকাসে নড়বড়ে হাড্ডিসার!

তোমরা হয়তো ভাবতে পার, পেঁচো তো একা, এত বড় পেল্লায় উপমহাদেশটাকে সে একা বাগে আনলো কি করে?

আরে, সে আর এক বৃত্তান্ত। ও রহস্য বুঝতে হলে ভূত-দুনিয়ার সমাচার কিঞ্চিৎ জানা দরকার। ঠাকুমা, দিদিমা, দাদু বা মা বা ঐ ধরনের আর কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখ না, তাহলে জানতে পারবে, ভূতেরা ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে একই সময়ে অসংখ্য চেহারা ধারণ করতে পারে। মহাধুরন্ধর পেঁচোও যে তা পারবে, তাতে আর সন্দেহ কি! এবং তা-ই সে করলো। ভারত ও পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেঁচো স্বাধীনতা-যুদ্ধের ছোট-বড় নানা 'আত্মত্যাগী নেতা ও কর্মী'র রূপ ধারণ করলো, অগুনতি আমলা-অফিসারের চেহারা গ্রহণ করলো এবং ব্যবসায়ী-কারবারী ও শিল্পপতিদের রূপ পরিগ্রহ করলো। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-ওয়ালাদেরও সে ছেড়ে দিলে না। এমনি অসংখ্য ছদ্মবেশ যেমন সে নিল, তেমনি নেতা মাতব্বর শ্রেণীর অনেকের স্কন্ধেও ভর করলো।

আর তার পরেই শুরু হলো ছদ্মবেশী পেঁচোদের মজার রামরাজত্ব—বেধড়ক লুটপাট আর রক্তচোষণের কারবার। সরকারী-বেসরকারী আমলাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুষ ও দুর্নীতির ঢালাও কারবার বাসা বাঁধলো, ব্যবসায়ী-শিল্প-পতিদের মধ্যে চললো ভেজাল আর চোরাকারবারী ও কালো-বাজারী মুনাফা লোটার দেদার পাল্লা, আর লাইসেন্স, পারমিট, কন্ট্রাক্টরি, দালালি প্রভৃতি অসংখ্য জাতের সুরুক-সন্ধানীদের অবাধ তৈলমর্দনে পিছল হয়ে গেল রাজ্যির যত দপ্তরখানা! কর্তাদেরই বা সে কী স্বজন পোষণ ও তোষণের হুল্লোড়!

এর ফল কি হলো? ফল হলো, দেশগঠন বা সাধারণ মানুষের ভাল করার নামে যত অর্থই ঢালা হোক, কাজের কাজ আর কিছুই হয় না বা লোক-দেখানো যেটুকু হয়, তাতেও থাকে আগাগোড়া ভেজাল আর ফাঁকি। দেশের নামে বিদেশের ছোট-বড় বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অপর্যাপ্ত ঋণ নেওয়া হয়। সে যে কী অপরিমিত অর্থ তা তোমার-আমার মতো সামান্য মানুষ হিসেব করে কূল পাবে না। শুধু এইটুকু শুনে রাখ, আমাদের সক্কলের অধস্তন চোদ্দ পুরুষের মাথার চুল পর্যন্ত ঐ ঋণের দায়ে বিদেশের কাছে বিকিয়ে আছে।

এত অর্থ, এত সম্পদ, তবু কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়

না—একমাত্র বাগাড়ম্বর আর বক্তৃতার তুবড়ি ওড়ানো ছাড়া। জিনিসপত্রের দাম তর তর করে ওপর দিকে উঠতে থাকে, ভেজালে দেশ ছেয়ে যায়। আর দেশের জনসাধারণের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়, গরিব আরো গরিব হয় এবং বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলে হু-হু করে। এটাই তো হওয়ার কথা। কারণ অর্থ সম্পদ সবই যে চলে যাচ্ছে ছদ্মবেশী পেঁচোদের অতল গহ্বরে। তারা ফুলে ফেঁপে উঠছে।

কখনো সখনো জনসাধারণ যখন আর মার খেয়ে খেয়ে পারে না, রাগে দুঃখে হয়তো জ্বলে উঠতে চায়, তখন শুরু হয় পেঁচোদের অন্য ধরনের কর্মীর্তি।

জনদরদী সেজে পেঁচোদের চর সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের বেদনা-বিক্ষোভকে ভুল পথে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে সমানে চলতে থাকে পুলিসী দুরমুশ আর প্যাঁদানি। ব্যস্, সব ভণ্ডুল।

কখনো বা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যেন দাবাখেলা শুরু হয়। শুরু হয় গরম গরম বাতচিৎ—কথার ঠোকাঠুকি আর সাম্প্রদায়িক উস্কানি। এ সেই একই খেল্, যার ঠেলায় রক্তনদীর মধ্যে 'ভারতবর্ষ' কবরে গিয়েছিল সেই ছাব্বিশ বছর আগে।

কখনো কখনো যুদ্ধের দামামাও বেজে ওঠে দু দেশের মধ্যে। পেঁচোদের তখন আরো পোয়াবারো। লড়াইয়ের মওকায় দুরন্ত তোড়ে চলে তাদের লুটপাট, শোষণ ও রক্ত-চোষণ। আর ঠাণ্ডা বনে যায় জনসাধারণ।

কিন্তু ঠাণ্ডা বনে না পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা। গোঙানি বন্ধ করে তারা পাকিস্তানী চোষণ, লুটপাট ও ঠ্যাঙানির বদলে শুরু করে পাল্টা মার। তারপর অগুনতি প্রাণের বিনিময়ে রক্তের নদী পার হয়ে তারা বেরিয়ে আসে পাকিস্তানের জোয়াল ভেঙে এবং পত্তন করে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে বাংলাদেশের বাঙালী পেঁচোরা গোড়ায় বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেছে। কথায় বলে, 'রতনে রতন চেনে'। পেঁচোরা পাকা জহুরী। তাদের চিনতে দেরি হয়নি। আগের চেয়ে তাই দ্বিগুণ তিনগুণ জোরে চলেছে তাদের রক্তচোষণ আর লুটপাট—কালোবাজারি, চোরাকারবার ও ভেজালের ফলাও ব্যবসা। মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকিছুই দুর্লভ ও দুর্মূল্য। আর চলেছে ডাকাতি খুন রাহাজানি নিত্যকার ঘটনা—ঘটছে যখন তখন। পেঁচোরা ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর সেই সঙ্গে অমন সুখের রাজত্ব অটুট রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে জন-সাধারণের মধ্যে। অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় অবস্থার কোন হেরফের নেই সেখানেও।

বুঝলে বন্ধু, এই হলো ভূতপূর্ব ভারতবর্ষ বা বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের কিস্সা বা কেচ্ছা বা কাহিনী যাই বলো না কেন। ভারতের গত সাধারণ নির্বাচন ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে অল্পবিস্তর সুদিনের আশা জেগেছিল। সমাজতন্ত্র কায়েম হবার স্বপ্ন ক'জন দেখেছিলেন, বলা শক্ত। কারণ ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, সমাজতন্ত্র কায়েমের পথ এ নয়, সে পথ অন্য। আর পেঁচোরা তো তা অতি উৎকৃষ্ট ভাবেই জানে। তবে এই নিদারুণ কষ্টের কিছুটা লাঘব হবে, এ আশা জেগেছিল অসংখ্য জনার মধ্যে।

সেসব স্বপ্ন-প্রত্যাশা আজ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে। এবং ভাঙছে অতি দ্রুত। মানুষের মনে গুরুতর প্রশ্ন আবার মাথা তুলছে—নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার জন্য এ কি সেই মর্মান্তিক পুরনো খেলারই পুনরাবৃত্তি? তার জন্যেই কি মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করা হয়েছিল নতুন করে?

মানুষের দুরবস্থার দফাওয়ারী আলোচনা করে লাভ নেই। খাদ্যবস্ত্র থেকে আরম্ভ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম কমা তো দূরের কথা বেড়েছে কয়েকগুণ এবং বাড়ছে প্রতিদিন। বাজার তেতে আগুন—সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই সংসার-যাত্রাও তাদের অচলপ্রায়। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মারাত্মক ভেজালের ব্যাপকতা। আজ ভেজাল নেই কোথায়? ভেজাল সব কিছুতেই।

হাজারে একটি ঘর মিলবে কিনা সন্দেহ, যেখানে বেকার নেই। বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। প্রতিদিন বাড়ছে তাদের সংখ্যা। কোথায় কাজ, কোথায় চাকরি!—হন্যে হয়ে ঘুরছে লেখাপড়াজানা তরুণ ও যুবকের দল। কোন দরজাই খোলা নেই। কি করেই বা থাকবে? দালালি, কণ্ট্রাক্টরি আর কালোবাজারি ও ভেজালের কারবার ছাড়া চালু সমস্ত কল-কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যই যে আজ ধুঁকছে ও খাবি খাচ্ছে। নতুন এমন কোন উল্লেখযোগ্য সুযোগেরও সৃষ্টি হয়নি যে, চাকরি মিলবে।

পেঁচোরা যেখানে সর্বেসর্বা ও সব কিছুর মোড়ল, সেখানে এটাই স্বাভাবিক, যা ঘটার তাই ঘটছে। মানুষের অন্তর থেকে আজ দয়া, মায়া, সমবেদনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অস্থিরতা বাড়ছে কিশোর, তরুণ ও যুব মানসে। তাদের একটা বড় অংশ বাঁচার তাগিদে পা দিচ্ছে অন্ধকার পিচ্ছিল পথে। নিষ্ঠুর অমানুষ হয়ে উঠছে তারা। দিনে দিনে আবার বৃদ্ধির দিকে চলেছে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও নির্মম হৃদয়হীনতা আজ যেন মৌরুসী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে—শাসনযন্ত্রের পাকে পাকে, চাকরির বাজারে, চিকিৎসাদি পেশার ক্ষেত্রে, ব্যবসার দুনিয়ায়, শিক্ষার জগতে—কোথায় নয়! আবার অন্ধকার জমাট বাঁধছে, নৈরাশ্য গ্রাস করছে সমাজ সংসার সব কিছু। ঘরে ঘরে আজ তাই শোনা যায় গোঙানি আর চাপা কান্না।

এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির পথ কোথায়? এ এক মহাপ্রশ্ন, বন্ধু। এ তল্লে কোথায় আছে সে পথ—বড় কঠিন তা খুঁজে পাওয়া। মনে করো দুর্নীতি, অপচয়, ভেজাল, চোরাকারবার প্রভৃতি বন্ধ করতে চাও। কি করে কাকে দিয়ে তা করবে? পেঁচোরা যে গোবেচারা ভালমানুষ সেজে ওপর

থেকে নীচে পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষ বিশেষ স্থানে বসে আছে! যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াবে, তার মধ্যেই যে বসে আছে পেঁচো ভূত!

কিন্তু তাই বলে কি কোন পথ নেই? আছে। তবে সর্টকাট সোজা কোন পথ নেই। যে পথ আছে তা বেশ শক্ত, তা গ্রহণ করার আগে কর্তাব্যক্তিদের খুব ভাল করে মনস্থির করতে হবে। সে পথ অনুসরণ করতে হলে প্রথমেই চাই দেশপ্রেম, জনসেবা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত সুসংহত একটি পার্টি ও কর্মীদল। তাদের কাজ হবে শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি এলাকায় দিনের পর দিন নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে দেশ গড়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করা। শোষণ ও বর্তমান সংকটের সর্বাঙ্গীণ রূপটা খুলে ধরতে হবে তাদের সামনে। জনগণের পরামর্শে ও সহযোগিতায় গ্রহণ করতে হবে উন্নয়নমূলক ছোটবড় সব পরিকল্পনা যেগুলির সঙ্গে থাকবে তাদের নাড়ির যোগ, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিবিড়তম সম্পর্ক। সেই সঙ্গে তাদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে সেই সব আদর্শবান নিঃস্বার্থ কর্মঠ কর্মী, দেশ ও সমাজের সেবা ও মঙ্গল সাধনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য পূরণে জনসাধারণকে তারা দিতে পারবে সঠিক নেতৃত্ব। এদের কাজ হবে দ্বিবিধ—জনগণের কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ও সফল করা আর যেখানে যে ছদ্মবেশী পেঁচো আছে তাদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করা। এ কাজটা অর্থাৎ পেঁচোদের হদিস দিতে পারে একমাত্র জনসাধারণই। নিজেদের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা ও চোখের জলের মধ্য দিয়ে পেঁচোদের তারা যেভাবে চিনেছে, তেমন চেনা আর কে চিনবে বলো!

এই হলো অতি সংক্ষেপে সত্যিকার কর্মযজ্ঞের পথ—ভাঙন ও বিপর্যয় রোধ করে নতুন করে দেশ গড়ার পথের এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এখানে দলীয় স্বার্থ, কায়েমী স্বার্থ বা অন্য কোন গোপন স্বার্থের পেছুটান থাকলে চলবে না, তাহলে পণ্ড হবে কাজ।

কিন্তু বন্ধু আজ যে অবস্থা, তাতে কি মনে করো, এ পথ গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা আছে? তাহলে উপায়? উপায় একমাত্র তোমরা। বাঁচুক আর মরুক, দেশের মানুষকে হয়তো অপেক্ষা করে থাকতে হবে সেই সুদিনের আশায়, যেদিন তোমরা এসে তাদের নেতৃত্ব দেবে, দেখাবে সঠিক পথের নিশানা। তাই সত্যিকার মানুষ হওয়াই, মনে হয়, তোমাদের আজ একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা হওয়া উচিত। ভুলে যেও না বন্ধু, তোমরাই আজ দেশের একমাত্র ভরসাস্থল। এজন্য তোমাদের ধাপে ধাপে নিজেদের তৈরি করতে হবে, পড়তে হবে অনেক কিছু—দেশের ও বিদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি। পড়তে হবে দুনিয়ার মুক্তিসংগ্রামের নিখুঁত ইতিবৃত্ত, বিভিন্ন জাতির দেশগঠনের অভিজ্ঞতা ও আরো অনেক কিছু। আর সেই সঙ্গে হাতে কলমে অর্জন করতে হবে জনসেবার অভিজ্ঞতা। এ ব্যাপারে অর্থাৎ বাঁচার পথ খোঁজার কাজে কোন ফাঁকি চলে না, সস্তায় কিস্তিমাতের পন্থাও অচল। গোড়া থেকে ঐটাই অবশ্য চলে আসছে আমাদের দেশে আর তার ফল আমরা টের পাচ্ছি মর্মে মর্মে। তাই তোমরা কোন মিষ্টি কথায় ভুলো না, রক্ত-গরম-কথায় উত্তেজিত হয়ো না। ও জাতীয় ফাঁদে ও প্রলোভনে পা দিও না কখনও।

দেশকে বাঁচানোর সংকল্প সামনে রেখে তোমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আজ এখানে শেষ করছি। তোমরা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস গ্রহণ করো। ইতি—

তোমাদের **সম্পাদক বন্ধু**

বনে যারা থাকে

বনে যারা থাকে, তাদের আমরা বলি বন্য। বন্যদের মধ্যে আছে নানা ধরনের পশু ও পাখি, বৈচিত্র্যে যারা অনন্য। তারা যে শুধু বনের শোভা বাড়ায় তা নয়, লোকালয়ের মানুষদেরও উপকার করে, তাদের জীবনকেও করে তোলে আনন্দময়।

বন্য পর্যায়ের অনেক প্রাণীকেই আমরা হিংস্র বলে মনে করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা আমাদের নিজেদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত। বাঘ, ভালুক, সিংহ, বুনো হাতি, শুয়োর প্রভৃতি যাদের আমরা হিংস্রতম প্রাণী বলে মনে করি, তাদের মধ্যে অকারণ হিংস্রতা আমরা কতটুকু দেখতে পাই? কদাচিৎ নয় কি? সাধারণতঃ ক্ষুধা বা আত্মরক্ষার তাগিদেই তো তাদের হননের কাজে নামতে দেখা যায়। মানুষখেকো বাঘ বা চিতাবাঘের মানুষের ওপর আক্রোশ কি অকারণ? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিকারীদের হাতে আহত হয়েই তো তারা মানুষখেকো হয়ে ওঠে। অনেক সময় অবশ্য বৃদ্ধ বা অথর্ব হওয়ার দরুন হরিণ, সম্বর, বুনো শুয়োর প্রভৃতি দ্রুতগামী প্রাণীকে কাবু করবার ক্ষমতা তাদের থাকে না, অথবা এমনও হয় যে মানুষই তাদের খাদ্য-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়েছে, তাদের ভক্ষ্য প্রাণীদের মেরে নির্মূল করে ছেড়েছে, তখনই তারা শুধু পেটের জ্বালায় লোকালয়ের কাছাকাছি এসে মানুষের ওপরে হামলা করতে শুরু করে।

তাই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অকারণ হিংস্রতা বন্য পশুদের নেই, তা পুরোপুরি বর্তমান মানুষের মধ্যেই। শিকারের নেশা মানুষের এই অকারণ হত্যাস্পৃহার সবচেয়ে বড় একটি উদাহরণ। বন্য পশুদের দিক থেকে দেখলে, এবং তা আজ দেখা একান্ত প্রয়োজনও বটে, দেখা যাবে, তাদের চোখে মানুষই বোধহয় হিংস্রতম জীব। নিছক হত্যার স্পৃহা মেটাবার জন্য পশুহত্যা মানুষ ছাড়া আর কেউই করে না।

শিকারীদের শিকারের নেশা বনের পশুপাখিদের মধ্যে চিরকালই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আসছে। তাদের বেপরোয়া হত্যালীলার ফলে বনের পশুপাখিদের সংখ্যা আজ কমে আসছে অভাবনীয় হারে। কিছু কিছু প্রাণী একেবারেই নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের সিংহ ও গণ্ডারের কথা বলা যায়। গুজরাটের গিরনরের স্যাংচুয়ারি বা অভয়ারণ্য ছাড়া আর কোথাও সিংহ দেখা যায় না। তেমনি জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যের গণ্ডির মধ্যে মাত্র কয়েকটি গণ্ডার তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পঞ্চাশ বছর আগে যে বাঘ সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত ছিল, তার সংখ্যা এখন প্রায় মাত্র তিন হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য বন্য প্রাণীদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।

সুতরাং বনের পশুপাখিদের দিক থেকে অবস্থাটা কতখানি মর্মান্তিক দাঁড়িয়েছে, তা কি আজ আমাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত নয়? এর ফলে আমরাও কিন্তু এগিয়ে চলেছি বিপর্যয়ের দিকে। সর্বত্র যেমন, প্রকৃতির জগতেও তেমনি কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। মানুষ যদি সেসব নিয়মকানুনের পরোয়া না করে বনভূমি ও বন্য প্রাণী নির্বিচারে নিশ্চিহ্ন করে চলে, তাহলে তার নীট ফল দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে আর আমাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠবে এক সর্বনাশা পরিণতি।

এভাবে চললে বন্য প্রাণী ও বনভূমি অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা আজ দেশের বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে। ভারত সরকারও যে এ বিষয়ে কতকটা তৎপর হয়ে উঠেছেন, তা-ও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে।

ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ ও লেখক সংকর্ষণ রায় ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে ঘুরে বনের পশুপাখিদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন এবং স্বভাবতঃই দরদী মন নিয়ে তাদের সংরক্ষণের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনাও করেছেন। কিশোর ভারতীর এই সংখ্যা থেকে শুরু করে তাঁর সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি গল্পাকারে পরিবেশন করে চলবেন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। বনে যারা থাকে তাদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে যারা হানিকর তারা ছাড়া বনের অধিকাংশ প্রাণীই সংরক্ষণযোগ্য। তারা বেঁচে থাকলে মানুষের জীবনই হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময়।

—সম্পাদক।

চিরিমিরির গভীর জঙ্গলের মধ্যে আমাদের ক্যাম্প। এখানে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন তাঁবু খাটিয়ে বাস করছি। আমাদের কাজ হল বনের মধ্যে মাটির নীচে কয়লার স্তরের সন্ধান।

সেদিন সারাদিনের কাজের শেষে আমরা ক্যাম্পে ফিরে যে যার তাঁবুতে ঢুকে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় আমাদের গাইড্ দৌলত আমার সহকর্মী গোপীনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে হুজুর...

ইতিমধ্যে তাঁবু থেকে গোপীনের স্ত্রী ইলা বেরিয়ে এসেছিল, দৌলতের মুখের ওপরে ভ্রূকুটি হেনে সে বললে, তোমার নিবেদন যাই হোক, তোমার সাহেব কিন্তু

এখন বেরোতে পারবেন না।

আহা বেরোতেই যে হবে তার কী কথা আছে!—গোপীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে উঠল,—সে রকম কোন জরুরী ব্যাপার না হলে কি আমি বেরোই! বলুকই না ও কী বলতে চায়...

—ও কী বলতে চায় আমার জানা আছে—নিশ্চয়ই কোন শিকারের খবর.....শোনামাত্রই তুমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে বেরিয়ে পড়বে.....

শিকারের খবর!—গোপীন উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠল।—না, না, সে কী করে হবে! তেমন কোন খবর হলে দৌলত নিশ্চয়ই আগেই বলত আমাকে!

মুখ গোমড়া করে ইলা বললে, সে কী আর ও বলে কখনো! কারণ ও জানে তোমাদের কাজের সময়ে ও কথা তোমার কানে ঢুকলেও মনে ঢুকবে না!

গোপীন হেসে ফেলে বললে, তুমি দেখছি দৌলতকে আমার চেয়ে বেশি চিনে নিয়েছ! কি হে দৌলত, চুপ করে আছ কেন—বল কী বলতে চাও.....

টেংনীর চিতাবাঘ

● সংকর্ষণ রায় ●

দৌলত মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, মাইজী যখন চান না যে আপনি এখন বেরোন তখন আর কী হবে খবরটা দিয়ে...কিন্তু চিতাটা সত্যিই বড় উপদ্রব শুরু করেছে—কাল রাতে আমাদের গাঁয়ের মুখিয়ার (মোড়ল) দুধেলা গাইটাকে মেরে ফেলেছে.....

শুনছ তো ইলা দৌলত কী বলছে!—গোপীন উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,—দৌলতদের গাঁয়ে চিতার উপদ্রব শুরু হয়েছে.....ওটাকে না মারলে ওদের গাঁয়ের গরু-ছাগলগুলোকে বাঁচানো মুশকিল হবে!

ঠিকই বলেছেন হুজুর।—উজ্জ্বল হয়ে উঠল দৌলতের মুখ।—ওটাকে এখনই মারা দরকার। চিতাটা ঐ গাইটাকে আমাদের গাঁয়ের সীমানার বাইরে নালার ধারে মেরে রেখে গিয়েছে। গাইটার লাশের পাশে একটি গাছের ওপরে মাচান বেঁধে রাখতে বলে এসেছি—ওখানে গিয়ে বসলে আজ রাত্রেই পেয়ে যাবেন চিতাটাকে।

আমি বললাম, কী করে জানলে যে চিতাটা আজ রাত্রেই আসবে আবার গরুটার লাশের কাছে?

দৌলত বললে, মেরে রেখে গিয়েছে, খেতে আসবে না?

—মেরেই খায় নি বুঝি?

—খেয়েছে, কিন্তু একবারে অত বড় একটা গরুর লাশের কতটুকু খেয়ে শেষ করতে পারবে বলুন! চিতাটা যত বড়ো হোক না কেন, ঐ গরুটাকে খেয়ে শেষ করতে ওর চার-পাঁচ দিন লেগে যাবে।

সে সুযোগ ওকে দেওয়া হবে না।—গোপীন বললে—আজ রাত্রেই ওকে মেরে শেষ করে ফেলব।

আমি বললাম, আচ্ছা গোপীনদা, যতদূর জানি আমাদের দেশে চিতা নেই। এই চিরিমিরির জঙ্গলে চিতা এল কী করে বলতে পারেন?

মৃদু হেসে গোপীন জবাব দিল, চিতা নয় হে, চিতাবাঘ—ইংরেজীতে যাকে লেপার্ড (Leopard) বা প্যান্থার (Panther) বলে। চিতা আর কোথায় পাবে ··আফ্রিকাতে আছে হয়তো...কিন্তু তা-ও সংখ্যায় খুব কম...

—চিতা ও চিতাবাঘে তফাৎ কী গোপীনদা?

—অনেক তফাৎ। চিতা-বাঘ হচ্ছে বাঘের মতই বিড়ালজাতীয় প্রাণী, কিন্তু চিতার মিল রয়েছে কুকুরের সঙ্গে। চিতাকে দেখলে খুব বড়ো আকারের কুকুর বলে মনে হবে। চিতা চিতা-বাঘের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী। শুধু চিতাবাঘ কেন, যে কোনও জন্তুর চেয়ে জোরে দৌড়তে পারে চিতা—তার গতিবেগ ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। চিতা চিতাবাঘের মত হিংস্র হয় না কখনো। ক্ষুধার তাগিদে বুনো শুয়োর বা হরিণ মারলেও চিতা মানুষ বা মানুষের গৃহপালিত পশুদের ওপরে হামলা করে না কখনো। চেষ্টা করলেই চিতাকে পোষ মানানো যায়, কিন্তু চিতাবাঘকে পোষ মানানো অসম্ভব ব্যাপার।

—দুয়ের মধ্যে এতই যখন পার্থক্য, তখন নামের মিল হল কেন?

—নামের মিল তো আমাদের ভাষায়। ইংরেজীতে চিতাকে 'চিতা' (Cheetah) বললেও চিতাবাঘকে 'লেপার্ড' (Leopard) বা 'প্যান্থার' (Panther) বলে।.....

—আমাদের ভাষায় এই নামের মিল হল কেন বলতে পারেন?

—দুয়ের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলেই হয়েছে।

চিতা ও চিতাবাঘের গায়ের চামড়া সাধারণত একই রকম হয়ে থাকে। কালো রঙের ব্লাক প্যান্থার বা ধোঁয়াটে রঙের লেপার্ডকে বাদ দিলে চিতাবাঘের গায়ের চামড়ায় চিতার মতোই হলুদ জমিনের ওপরে কালো ছোপ বা স্পট্‌স্‌ (Spots) দেখা যায়...তাছাড়া চিতাবাঘ চিতার মতই গাছে উঠতে পারে.....

দৌলত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, এসব আলোচনা পরে করলেও চলবে হুজুর—এখন চলুন রওনা হওয়া যাক। দেরি করলে আমাদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে.....

এখনই রওনা হবে মানে!—ইলা ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল—নাওয়া-খাওয়া না সেরেই বেরোবে না কি!

গোপীন বললে, আহা চটো কেন! নাওয়া-খাওয়া সেরেই বেরোবো।.....সংকর্ষণ, আমাদের সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ তো?

নিশ্চয়ই যাবেন।—ইলা আমার হয়ে জবাব দিল—একা তুমি দৌলতের সঙ্গে গেলে কি আর রাত্রের মধ্যে ফিরে আসবে.....হয়তো সেবারের মত পর পর তিন রাত কাটিয়ে আসবে দৌলতদের গাঁয়ে।.....

গোপীনের নির্দেশমত তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসলাম আমরা। খেতে খেতে আমি গোপীনকে বললাম, সেদিন একটা বইয়ে পড়ছিলাম যে বাঘের মত চিতাবাঘের সংখ্যাও শিকারীদের নির্বিচার হত্যা অভিযানের ফলে কমে আসছে ক্রমশঃ। আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে মোট পাঁচ বা সাত হাজারের বেশি চিতাবাঘ আর অবশিষ্ট নেই এখন.....

গোপীন গম্ভীর মুখে বললে, নির্বিচার হত্যা অভিযান কাকে বলছ! জানো চিতাবাঘ মানুষের কতখানি ক্ষতি করে থাকে! চিতাবাঘ নামেই বন্য প্রাণী, তার স্বভাব হচ্ছে লোকালয়ের কাছে ঘুর ঘুর করে বেড়ানো এবং সুযোগ পেলেই গৃহপালিত গরু-ভেড়া-ছাগল এমন কি হাঁস-মুরগী মেরে ফেলা।

আমি বললাম, বনের মধ্যে হরিণ বা বুনো শুয়োরের সংখ্যা কমে আসছে বলেই বোধহয় সে বাধ্য হয়েছে মানুষের পোষা পশুদের দিকে নজর দিতে।

—মোটেই তা নয়। আসলে বনের মধ্যে হরিণ বা শুয়োর মারতে যে পরিশ্রম হয়, তার তুলনায় অনেক সহজে মানুষের পোষা জানোয়ারদের বাগে আনতে পারে বলেই সে তার খাদ্য সংগ্রহের জন্য লোকালয়ে চলে আসে। সুযোগ পেলে সে মানুষ মেরেও খায়...

—তাই নাকি!

—মানুষ মানে শিশু বা দশ-বারো বছরের ছেলে-মেয়ে.....জোয়ান বয়সী মানুষদের দিকে সহজে ঘেঁষতে চায় না সে। কারণ সে জানে যে জোয়ান বয়সী মানুষদের অনেকেরই হাতে হাতিয়ার থাকে...ভারি ধূর্ত এই চিতাবাঘ.....

আমি বললাম, কিন্তু আমি শুনেছি যে, আফ্রিকার জঙ্গলে চিতাবাঘের সংখ্যা কমে আসছে বলে বুনো বাঁদর ও শুয়োর সংখ্যায় অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়ে লোকালয়ে এসে ফসল নষ্ট করছে ব্যাপকভাবে...সেজন্য চিতাবাঘ শিকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে.....

গোপীন বললে, দেখ ভাই, আমাদের দেশ আফ্রিকা নয়.....এদেশের চিতাবাঘ বুনো বাঁদর বা শুয়োর মেরে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে এমন কথা শুনি নি কখনো। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা এদেশে চিতাবাঘ মানুষের ক্ষতি করে থাকে। চিতাবাঘের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে মেরে না ফেলে কোন উপায় নেই।

এর পর আমি আর কোন কথা বললাম না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে জীপে করে রওনা হলাম আমরা। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফাঁকরে-ছাওয়া রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের দিকে—সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি আমরা।

প্রায় মাইল দশেক একটানা চলার পর আমরা নেমে এলাম চিরিমিরি পাহাড় থেকে। নীচের দিকে বনের ঘনত্ব অনেক বেশি—ওপর থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড নীল রঙের কার্পেট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে নীচের সমতল ভূমিকে।

নীচে নেমে এসে বৈকুণ্ঠপুরের সড়ক ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটা গরুর গাড়ি চলাচলের উপযোগী। তার ওপর দিয়ে অনেক কষ্টে জীপটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় গোপীন। রাস্তাটা এত সরু যে পথের ধারের গাছপালাকে ছুঁতে পারি আমরা হাত বাড়িয়ে।

এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টাখানেক চলবার পর টেংনী গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা।

দৌলত বললে, এই আমাদের গ্রাম টেংনী—গাঁয়ের বাইরে নালার ধারে চিতাটা গরুটাকে মেরেছিল। যেখানে মেরেছিল, লাশটা সেখানেই পড়ে আছে—আমরা তাকে সরাই নি।

গোপীন বললে, ওখানে কী জঙ্গল খুব ঘন?

—না হুজুর, জঙ্গল ওখানে পাতলা হতে শুরু

করেছে। আশেপাশে কিছু কাঁটাঝোপ ও কয়েকটা 'বীজা' গাছ আছে।

—মাচান বেঁধেছ কোথায়?

—গরুর লাশের সামনেই হুজুর। একটা 'বীজা' গাছের মাথায় বেঁধে রেখেছি।

—ঠিক আছে, চল এখন নালার ধারে যাই আমরা।

নালার ধারে একটা ফণীমনসার ঝোপের পাশে গরুর মৃতদেহটি পড়েছিল। তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি মাংস খুবলে নিয়েছে চিতাবাঘটা—গরুটাকে মেরে ফেলেই সে তার মাংস খেতে শুরু করেছিল বোধ হয়।

গোপীন প্রশ্ন করল, গরুটাকে মারল কখন?

কাল রাত্রে হুজুর।—দৌলত জবাব দিল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানকার ফাঁকগুলোতে ক্রমশঃ অন্ধকার জমতে থাকে। দৌলত ফিসফিসিয়ে বললে, সময় হয়ে এসেছে হুজুর .....চলুন গাছের ওপরে মাচানে চড়ে বসি আমরা...

আমি বললাম, চিতাবাঘ তো গাছে উঠতে পারে... মাচানের ওপরে চড়ে বসে কী লাভ আছে কোন?

দৌলত বললে, অনেক উঁচুতে মাচানটা বেঁধে রেখেছি হুজুর। অতটা উঁচুতে উঠতে সময় লাগবে ওর .....তার আগেই ওকে গুলি করে ঘায়েল করতে পারবেন। তা ছাড়া চিতাটা গরুর লাশ ছেড়ে অন্য দিকে নজর দেবে বলে মনে হয় না.....

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, চিতাবাঘটা যদি টের পেয়ে যায় যে আমরা গাছের ওপরে বসে আছি!

গোপীন বললে, চুপচাপ নিঃসাড় হয়ে বসে থাকলে টের পাবে কী করে!

—গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যেতে পারে.....ওদের আঘ্রাণ শক্তি তো খুবই বেশি!

—গরুর মাংসের গন্ধ ছাপিয়ে কী আর আমাদের গন্ধ ওর নাকে আসবে! আর কোন কথা নয়, এখন চল মাচানের ওপরে উঠে বসি আমরা। কই হে দৌলত, মাচানটা কোন গাছের ওপরে বেঁধে রেখেছ? মাচানে চড়বার জন্য মইয়ের ব্যবস্থা আছে তো?

দৌলত বললে, আছে হুজুর—মইটা গাছের সঙ্গেই লাগানো আছে। এই যে এই গাছটার ওপরে মাচান বাঁধা আছে, পাশেই মইটা রয়েছে, উঠে পড়ুন হুজুর।

গোপীন জীপের পেছন থেকে বের করে আনল তার রাইফেল ও রাইফেলের গুলি ভর্তি ব্যাগ। তারপর দৌলতকে বললে, স্পটলাইট ও ব্যাটারিটা বের করে নিয়ে এস দৌলত।

'স্পটলাইট' অনেকটা গাড়ির হেডলাইটের মত দেখতে। ধরবার জন্য তার সঙ্গে হ্যাণ্ডেল লাগানো আছে—জ্বালবার জন্য আছে সুইচ। ব্যাটারি লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল—তার আলো হেডলাইটের মতই জোরালো।

স্পটলাইট ও ব্যাটারি নিয়ে গরুর মৃতদেহটির উত্তর দিকের 'বীজা' গাছটির দিকে এগিয়ে গেল দৌলত। মৃতদেহটির পাশেই দক্ষিণ দিকে একটি গাছ থাকতে উত্তর দিকের গাছটি সে বেছে নিল কেন ভেবে পেলাম না আমি। দৌলতকে প্রশ্ন করতে সে বললে, এখন তো মার্চ মাস—বাতাস বইছে দক্ষিণ দিক থেকে...দক্ষিণের গাছে বসলে দক্ষিণের বাতাসে আমাদের গায়ের গন্ধ গরুর লাশটির দিকে ভেসে যাবে...চিতার নাকে গিয়েও লাগবে...

গোপীন খুশী হয়ে বললে, ওয়াণ্ডারফুল...সত্যিই অসাধারণ তোমার উপস্থিত বুদ্ধি দৌলত!

দৌলতকে অনুসরণ করে 'বীজা' গাছটির একেবারে মাথার কাছে বাঁধা মাচানে চড়ে বসলাম আমরা।

মাচানটি আসলে একটি বড়ো আকারের দড়ির খাটিয়া। গাছের ডালগুলোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে মজবুত করে তা বাঁধা ছিল।

বেশ জুৎ করে বোসো ভাই।—গোপীন ভাল করে পরীক্ষা করে বললে।—ভালো করেই বাঁধা আছে—কাজেই পড়ে যাওয়ার ভয় নেই কোন।

মাচানের ওপরে পাশাপাশি বসলাম আমরা তিনজনে। গোপীনের হাতে তার রাইফেল, দৌলতের হাতে স্পটলাইট। গোপীন বসল আমার আর দৌলতের মাঝখানে।

গোপীন বললে, আর একটাও কথা নয়.....এখন থেকে আমাদের একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে হবে... জোরে নিঃশ্বাস নেওয়াও চলবে না! বাঘ বা চিতাবাঘের কান খুব সজাগ.....

চুপচাপ একেবারে নিঃসাড় হয়েই বসে থাকি আমরা। বনের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। পাখির কিচির-মিচিরও শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে তারা বুঝি সব ঘুমিয়ে পড়েছে।...

কৃষ্ণপক্ষের রাত। গাছপালাগুলো সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গিয়েছে। নীচে গরুর মৃতদেহটিও আর দেখা যাচ্ছে না।

গোপীন আঙুল তুলে ইশারা করতেই দৌলত স্পটলাইটের সুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারকে

তলোয়ারের মত চিরে ফেলল স্পটলাইটের চোখ ঝলসানো আলো।

নীচের ঝোপঝাড়ের ওপরে স্পটলাইটের আলো নড়ে চড়ে—মাঝে মাঝে গরুর মৃতদেহটিকে ছুঁয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে ইতস্ততঃ স্পটলাইটের আলোর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে দৌলত হঠাৎ একটি কুর্চি-লতার ঝোপের ওপরে আলোটাকে এনে থামাল।

আলো স্থির...দৌলতও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুর্চি-লতার ঝোপের দিকে...তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গোপীনও তাকায় সেদিকে।

হঠাৎ কুর্চি-লতার ঝোপটি নড়ে উঠল...ঝোপের আড়ালে কী যেন লুকিয়ে আছে...হয়তো চিতাবাঘ... সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় আমার হৃৎপিণ্ডের গতি বেগ।

রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকি কুর্চি-লতার ঝোপটির দিকে... হঠাৎ কী যেন বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে... স্পটলাইটের আলো তাকে ছোঁবার আগেই সে ছুটে এল গরুর মৃত দেহটির দিকে...

উঁচিয়ে ধরল গোপীন তার রাইফেল...সেই ছুটন্ত ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে তার রাইফেলের নল...

কেঁপে ওঠে স্পটলাইটের আলো...দৌলত আর্তস্বরে বলে উঠল, গুলি করবেন না হুজুর...ও চিতাবাঘ নয়!

আলো ফেলো ওর ওপরে।—গোপীন অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—তোমার হাত কাঁপছে কেন? কী হয়েছে?

—ও আমার মেয়ে রগ্‌গী হুজুর...

—তোমার মেয়ে!

—হ্যাঁ হুজুর, এই দেখুন...

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গরুর মৃতদেহের ওপরে আলো ফেলল দৌলত। সেই আলোতে দেখতে পেলাম যে একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে গরুটির পা ধরে টানাটানি করছে।

ও কী করছে তোমার মেয়ে!—গোপীন অবাক হয়ে বলল,—গরুটাকে ধরে টানাটানি করছে কেন?

—সে কী করে বলব হুজুর!...মা-মরা মেয়ে...দিন দিন জেদী ও একরোখা হয়ে উঠছে...ওর মতিগতি কিছুই বুঝি নে আমি...

রগ্‌গী ততক্ষণে গরুর লাশটাকে টেনে নিয়ে চলেছে নালার ধারের কাঁটাঝোপের দিকে।

অদ্ভুত গায়ের জোর তো তোমার মেয়ের!—গোপীন অবাক হয়ে বললে,—কিন্তু লাশটাকে নালার ধারে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে হুজুর!—অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—ওপাশের ঝোপটা যেন নড়ে উঠল...বোধ হয় চিতাবাঘ...

চুপ।—গোপীন ফিসফিসিয়ে বললে—একেবারে চুপ...ওপাশে আলো ফেল...

কিন্তু আমার মেয়ের ওপরে চিতাবাঘটি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে!—স্পটলাইট সুদ্ধ কাঁপতে থাকে দৌলতের হাত।

শাট্ আপ।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা আবর্তের সঞ্চার হল... তীরের বেগে ছুটে আসে একটা কালো স্রোত...

আলো ফেলবার ক্ষমতা নেই দৌলতের...তার হাত কাঁপছে থর থর করে। গোপীন আলোর জন্য অপেক্ষা না করে গুলি করল...

গোপীনের রাইফেলের গুলির সঙ্গে সুর মেলাল চিতাবাঘের গর্জন...পরমুহূর্তে মাটির ওপরে ভারি একটা কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল।

আমার মেয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুঝি চিতা বাঘ!—হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল দৌলত।

আলো ফেলেই দেখ না চিতাবাঘটা কী করছে।—ধমক দিয়ে উঠল গোপীন।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আলো ফেলল দৌলত। রগ্‌গী যেখানে গরুর মৃতদেহটির পা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছাকাছি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খুব বড়ো আকারের একটি চিতাবাঘের রক্তাক্ত দেহ। একেবারে নিঃসাড় ও নিস্পন্দ...বোধ হয় এক গুলিতেই ঘায়েল হয়েছে।

দৌলত অবাক হয়ে বললে, অন্ধকারের মধ্যেই ওকে ঘায়েল করলেন হুজুর...নিশান করলেন কী করে স্যার!

গোপীন মৃদু হেসে বললে, সব তোমার ও তোমার মেয়ের ভাগ্য দৌলত।...আমার রাইফেলের গুলি ফসকে গেলে সেটা কিন্তু তোমার দোষেই হত...এমনি ঘাবড়ে গেলে যে আলো পর্যন্ত ফেলতে পারলে না...

দৌলত গদ্‌গদ্ স্বরে বললে, আপনিই আমার মেয়ের জান বাঁচিয়েছেন হুজুর...কী বলে যে আপনাকে...

—থাক, থাক হয়েছে—এখন নামো দিকিনি গাছ থেকে...দেখ তোমার মেয়ে কী করছে।

গাছ থেকে নেমে চিতাবাঘটিকে পরীক্ষা করি আমি ও গোপীন। টর্চ জেবলে মাপবার চেষ্টা করি চিতা-বাঘটাকে...ল্যাজের ডগা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত প্রায় সাত হাত লম্বা হবে। গোল গোল কালো ছোপ-ধরা গায়ের হলুদ চামড়া ঝলমল করে টর্চের আলোয়। গুলি লেগেছে—ঘাড়ের কাছে—যাকে বলে নেক্‌শট্।

তলোয়ারের মত চিরে ফেলল স্পটলাইটের চোখ ঝলসানো আলো।

নীচের ঝোপঝাড়ের ওপরে স্পটলাইটের আলো নড়ে চড়ে—মাঝে মাঝে গরুর মৃতদেহটিকে ছুঁয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে ইতস্ততঃ স্পটলাইটের আলোর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে দৌলত হঠাৎ একটি কুর্চি-লতার ঝোপের ওপরে আলোটাকে এনে থামাল।

আলো স্থির...দৌলতও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুর্চি-লতার ঝোপের দিকে...তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গোপীনও তাকায় সেদিকে।

হঠাৎ কুর্চি-লতার ঝোপটি নড়ে উঠল...ঝোপের আড়ালে কী যেন লুকিয়ে আছে...হয়তো চিতাবাঘ... সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় আমার হৃৎপিণ্ডের গতি বেগ।

রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকি কুর্চি-লতার ঝোপটির দিকে... হঠাৎ কী যেন বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে... স্পটলাইটের আলো তাকে ছোঁবার আগেই সে ছুটে এল গরুর মৃত দেহটির দিকে...

উঁচিয়ে ধরল গোপীন তার রাইফেল...সেই ছুটন্ত ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে তার রাইফেলের নল...

কেঁপে ওঠে স্পটলাইটের আলো...দৌলত আর্তস্বরে বলে উঠল, গুলি করবেন না হুজুর...ও চিতাবাঘ নয়!

আলো ফেলো ওর ওপরে।—গোপীন অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—তোমার হাত কাঁপছে কেন? কী হয়েছে?

—ও আমার মেয়ে রগ্‌গী হুজুর...

—তোমার মেয়ে!

—হ্যাঁ হুজুর, এই দেখুন...

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গরুর মৃতদেহের ওপরে আলো ফেলল দৌলত। সেই আলোতে দেখতে পেলাম যে একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে গরুটির পা ধরে টানাটানি করছে।

ও কী করছে তোমার মেয়ে!—গোপীন অবাক হয়ে বলল,—গরুটাকে ধরে টানাটানি করছে কেন?

—সে কী করে বলব হুজুর!...মা-মরা মেয়ে...দিন দিন জেদী ও একরোখা হয়ে উঠছে...ওর মতিগতি কিছুই বুঝি নে আমি...

রগ্‌গী ততক্ষণে গরুর লাশটাকে টেনে নিয়ে চলেছে নালার ধারের কাঁটাঝোপের দিকে।

অদ্ভুত গায়ের জোর তো তোমার মেয়ের!—গোপীন অবাক হয়ে বললে,—কিন্তু লাশটাকে নালার ধারে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে হুজুর!—অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—ওপাশের ঝোপটা যেন নড়ে উঠল...বোধ হয় চিতাবাঘ...

চুপ।—গোপীন ফিসফিসিয়ে বললে—একেবারে চুপ...ওপাশে আলো ফেল...

কিন্তু আমার মেয়ের ওপরে চিতাবাঘটি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে!—স্পটলাইট সুদ্ধ কাঁপতে থাকে দৌলতের হাত।

শাট্ আপ।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা আবর্তের সঞ্চার হল... তীরের বেগে ছুটে আসে একটা কালো স্রোত...

আলো ফেলবার ক্ষমতা নেই দৌলতের...তার হাত কাঁপছে থর থর করে। গোপীন আলোর জন্য অপেক্ষা না করে গুলি করল...

গোপীনের রাইফেলের গুলির সঙ্গে সুর মেলাল চিতাবাঘের গর্জন...পরমুহূর্তে মাটির ওপরে ভারি একটা কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল।

আমার মেয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুঝি চিতা বাঘ!—হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল দৌলত।

আলো ফেলেই দেখ না চিতাবাঘটা কী করছে।—ধমক দিয়ে উঠল গোপীন।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আলো ফেলল দৌলত। রগ্‌গী যেখানে গরুর মৃতদেহটির পা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছাকাছি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খুব বড়ো আকারের একটি চিতাবাঘের রক্তাক্ত দেহ। একেবারে নিঃসাড় ও নিস্পন্দ...বোধ হয় এক গুলিতেই ঘায়েল হয়েছে।

দৌলত অবাক হয়ে বললে, অন্ধকারের মধ্যেই ওকে ঘায়েল করলেন হুজুর...নিশান করলেন কী করে স্যার!

গোপীন মৃদু হেসে বললে, সব তোমার ও তোমার মেয়ের ভাগ্য দৌলত।...আমার রাইফেলের গুলি ফসকে গেলে সেটা কিন্তু তোমার দোষেই হত...এমনি ঘাবড়ে গেলে যে আলো পর্যন্ত ফেলতে পারলে না...

দৌলত গদ্‌গদ্ স্বরে বললে, আপনিই আমার মেয়ের জান বাঁচিয়েছেন হুজুর...কী বলে যে আপনাকে...

—থাক, থাক হয়েছে—এখন নামো দিকিনি গাছ থেকে...দেখ তোমার মেয়ে কী করছে।

গাছ থেকে নেমে চিতাবাঘটিকে পরীক্ষা করি আমি ও গোপীন। টর্চ জেবলে মাপবার চেষ্টা করি চিতা-বাঘটাকে...ল্যাজের ডগা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত প্রায় সাত হাত লম্বা হবে। গোল গোল কালো ছোপ-ধরা গায়ের হলুদ চামড়া ঝলমল করে টর্চের আলোয়। গুলি লেগেছে—ঘাড়ের কাছে—যাকে বলে নেক্‌শট্।

অজস্র রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে।

দৌলত রগ্‌গীর কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এল আমাদের দিকে। আমাদের দুজনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর রাইফেলধারী গোপীনের মুখের পানে অগ্নিদৃষ্টি হেনে সে বললে, তুমিই মেরেছ বুঝি চিতাটাকে?

গোপীন জবাব দিল, হ্যাঁ মেরেছি...

কেন মারলে?—কান্নায় কাঁপানো স্বরে বললে রগ্‌গী—কী করেছিল ও তোমার!

—আমার কিছু করে নি, কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের মুখিয়ার গরুটাকে মেরেছিল। এরপর হয়তো তোমাদের গাই-ভেড়ার দিকেও নজর দিত।

—তা না হয় দিত...ক্ষিদে পেলে জানোয়ার মেরে ও খাবেই—ও তো আর আমাদের মত ডাল-ভাত-রুটি খেয়ে থাকতে পারবে না...তাই বলে ওকে মেরে ফেলবে?

নিশ্চয়ই মেরে ফেলতে হবে।—দৌলত রাগত স্বরে বলে উঠল—আমাদের গরু-ছাগল মেরে ফেলবে ও... আর আমরা ওকে ছেড়ে দেব!

গোপীন বললে, গোরুর লাশটাকে ধরে তুমি টানাটানি করছিলে কেন রগ্‌গী?

লাশটাকে লুকিয়ে রাখব ভেবেছিলাম।—রগ্‌গী জবাব দিল—মালার ধারে একটা গুহার মত আছে, সেখানে নিয়ে গেলে লাশটাকে আর তোমরা খুঁজে পেতে না। লাশটাকে না পেলে চিতাটারও নাগাল পেতে না।

—চিতাবাঘটাও তো খুঁজে পেত না লাশটাকে—তুমি যেখানে লাশটাকে লুকিয়ে রাখতে, সে জায়গাটি কী আর চিতাবাঘটা খুঁজে পেত!

—ওটা তো ওরই আস্তানা...দিনের বেলায় ওখানে ওকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি!

গোপীন বললে, ঐ গুহাটা আমাদের দেখিয়ে দেবে রগ্‌গী? হয়তো অন্য কোন চিতাবাঘ, মানে ওর জোড়টা ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে...

না, না, কক্ষনো না।—রগ্‌গী চিৎকার করে উঠল—আমি কক্ষনো তোমাদের ঐ গুহাটা দেখাব না।...আচ্ছা বাবু, ভগবান তো তোমার আমার মত ওদেরও প্রাণ দিয়েছেন...ওদের মেরে ফেলা কী পাপ নয়?

মৃদু হেসে গোপীন বললে, দেখ রগ্‌গী, আজ আমি ঐ চিতাবাঘটাকে মেরে না ফেললে ও তোমাকেই মেরে ফেলত। ও তো আর বোঝে নি যে তুমি গরুর লাশটাকে ওর আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছ—ও তোমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল...

না না কক্ষনো না।—রগ্‌গী কাঁদতে কাঁদতে বললে ও আমাকে চিনত...ওর আস্তানার কাছে কতবার গিয়েছি আমি, ও আমাকে কিছু বলে নি।

নেপালের পথে ও নগরে

• খগেন্দ্রনাথ মিত্র •

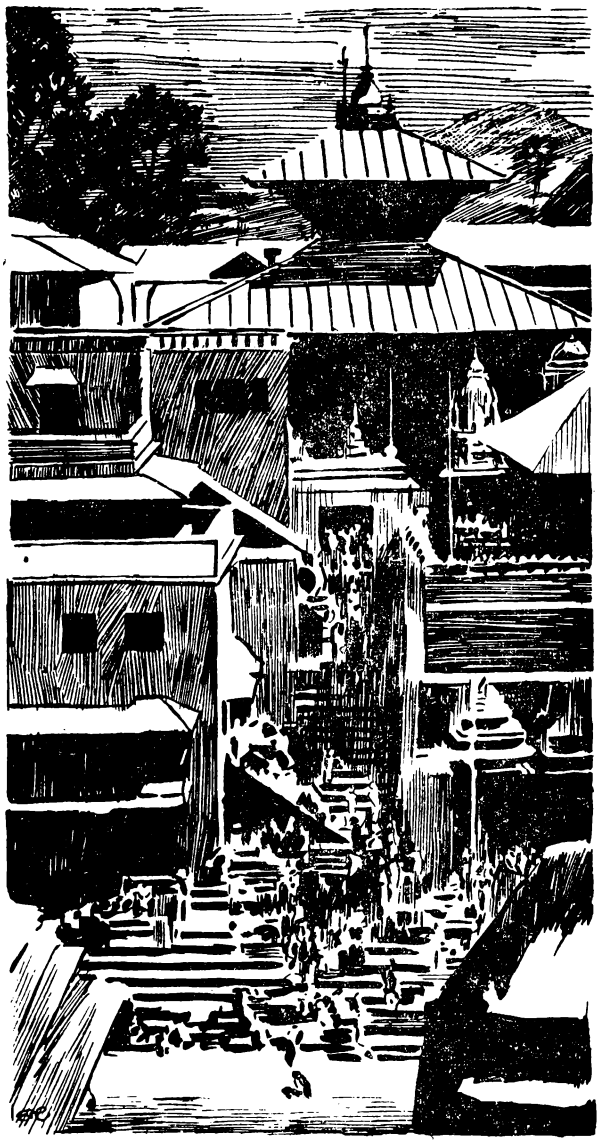

পশুপতিনাথের মন্দির

যাবার পথে

সেদিন (২৪শে অক্টোবর) সন্ধ্যা সাতটায় আমরা পৌঁছলাম বিহার রাজ্যের উত্তর সীমান্তে রকসৌল স্টেশনে। এরপর আর রেলপথ নেই। কারণ উত্তরে পূব থেকে পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছেন, 'হিমালয়ো নামঃ নগাধিরাজঃ'। আমরা চলেছি নগাধিরাজের মহান রাজ্যে—নেপালে। আমাদের লক্ষ্য—কাঠমাণ্ডু (স্থানীয় চলতি ভাষায় 'কাঠমাঁড়ু')। সেখানে পৌঁছতে হলে যেতে হবে স্থলপথে মোটরে একশ' আটাশ মাইল অথবা আকাশ পথে পাটনা থেকে প্লেনে। লোকে তুলনা দিতে কথায় বলে, 'আশমান জমিন ফারাক'। ও দুটি যানের ভাড়ায়ও তেমনি, 'আশমান জমিন বিস্তর ফারাক'। সাধারণ মানুষ আমরা, তাই চলেছি জমিনের পথ ধরে।

হাওড়া থেকে রওনা হয়েছি, আগের দিনে বেলা সাড়ে চারটায়। ভারত-নেপাল-সীমান্তে এসে পৌঁছলাম, পরদিন সন্ধ্যা সাতটায়! এলাম মানুষের হাতে গড়া ধানে ভরা রৌদ্রঢালা ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, নগর-গ্রামের ধার বা মাঝ দিয়ে, পার হলাম নদ-নদী—দামোদর, অজয়, গঙ্গা, লালকানিয়া, গোমতী। আর পার হলাম, মিথিলা, জনক-রাজার রাজ্য, সীতা দেবীর জন্মভূমি। দিগন্তে বিছানো ধানক্ষেত; তার মাঝে মাঝে ফুলে ভরা আখ-ক্ষেত শরতের বাতাসে আকাশের গায়ে সহস্র চামর দোলাচ্ছে। গাড়ির জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ভেবেছি, এর কোথায় ছিল 'জনকপুরী'? কামরায় কয়েকজন বিহারী যাত্রী ছিলেন। সে বিষয়ে তাঁদের প্রশ্ন করতে বলেন—জনকপুর নেপালে। সেখানে যেতে হলে সীতামারীতে নেমে চল্লিশমাইল মোটর-বাসে যেতে হবে।

—'নেপালে? বলছেন কি? জনকরাজার রাজ্য ভারতে আর রাজধানী নেপালে? রাজর্ষি তবে নেপালী ছিলেন? সীতাদেবীও নেপালের মাটিতেই—' নাঃ সব যেন কেমন ঠেকছে। হিমালয়ের একাংশ জুড়ে নেপাল রাজ্য। এ রহস্য কে ভেদ করবে? এদিকে আমার সহযাত্রী ডাঃ সেন-গুপ্ত একটি বিহারী যাত্রীর সঙ্গে 'সীতামারী' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন। তবু 'ডায়োগনসিস' ঠিক হচ্ছে না। এবং শেষ অবধি হলও না, বর্ধমানের 'সীতাভোগ' নামটির মতো রহস্যাবৃত রয়ে গেল।

সে রাত রকসৌল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে পরদিন সকালে টাঙায় চললাম সীমান্তে। আধ-ঘুমন্ত শহর। সূর্য সবে উঠেছে। সীমান্তপারে নেপাল রাজ্যের শহর বীরগঞ্জ থেকে কাঠমাণ্ডু যাবার বাস ছাড়বে বেলা সাড়ে সাতটায়। নেপালের ঘড়ি ভারতের ঘড়ির চেয়ে দশ-মিনিট আগে চলে। রেলস্টেশন থেকে বাস-স্ট্যান্ড তিন কিলোমিটার দূরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টাঙা চালককে বলি—'জলদি হাঁকাও'।

সে বলে, 'ঘাবড়াইয়ে মাৎ'।

তখন কি জানতাম, নেপালের ঘড়ি আগে চললেও লোকে তার থোড়াই পরোয়া করে? তারা চলে ধীরে-সুস্থে। টুক্‌টুক্‌ করে টাঙা এলো সীমান্তে। ও-পারে নেপাল রাজ্য, এ-পারে ভারত—দুইয়ের মাঝে একটি পাহাড়ি

খাদ। তার ওপর সেতু। সেতুমুখে এ-পারে সশস্ত্র ভারতীয় পুলিশ, ও-পারে নেপালী পুলিশ দাঁড়িয়ে। দেখা যাচ্ছে তরাইয়ের গভীর জঙ্গল, দেখা যাচ্ছে হিমালয়, কালো মেঘের মতো; ভারত থেকে ঝাঁকেঝাঁকে টিয়াপাখি উড়ে চলেছে সেদিকে। মন আনন্দে ভরপুর! মুক্ত সীমান্ত, পারাপারে সরকারী ছাড়পত্র বা পরিচয়পত্র দরকার নেই।

টাঙা আমাদের—ডাঃ সেনগুপ্ত ও আমায় নিয়ে এপারে সেতুমুখে পেঁছতেই বাঁ ধারে একখানা ছাপ্পড় থেকে ধুতি-কামিজ পরা একটা লোক বেরিয়ে এসে বললে,—'রোখো'।

দেখি, তার ডান হাতে ঘোলাটে তরল পদার্থ-ভরা, জল হওয়াও সম্ভব, একটা মাঝারি মোটা সিরিঞ্জ, বাঁ হাতে একটু তুলো। তুলোটুকু দিয়ে সে সিরিঞ্জের লম্বা ছুঁচটা ঘনঘন মুছতে মুছতে হিন্দীতে বললে,—'কলেরা-বসন্ত-টাইফয়েডের টীকে না নিয়ে ওপারে যাওয়া হবে না।'

শুনে আমরা হতভম্ব! তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—'ঐ সিরিঞ্জে বসন্তর টীকাও আছে নাকি?'

অসাধু, ধূর্ত সরকারী কর্মচারীটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, 'নেহি, উও দোসরা'। বলেই ছুঁচটা ঘনঘন মুছতে লাগলো, যেন ছুঁচটা আরো চোখা করছে। ইতিমধ্যে আরও দুখানি টাঙা আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো। তাতে স-পরিবারে ছিলেন দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ চৌধুরী ও সস্ত্রীক জনৈক শিক্ষক। তাঁরা আমাদের সুপরিচিত। ভাবছি, এই শয়তানটার হাত থেকে মুক্তির উপায় কী?

এমন সময়ে দেখি ডাঃ সেনগুপ্ত পকেট থেকে তাঁর খানকয়েক 'লেটার হেড' ও কলম বার করে লোকটাকে বললেন—'আমি ডাক্তার, আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি। তিন টাঙার যাত্রীদের সকলেরই টীকে নেওয়া আছে।' বলেই আমাদেরও পিছনের দুই টাঙার যাত্রীদের নাম লিখতে লাগলেন। সেই সময়ে আমাদের পাশ দিয়ে সোঁ করে ওপারে চলে গেল একখানি মোটর। তার আরোহীরা ইউরোপীয়, চালকও ইউরোপীয়। লোকটা গাড়ীখানার দিকে ফিরেও তাকালো না। সাহেব-বিবির প্রতি আমাদের দাস মনোভাব আজও গেল না, এর প্রমাণ পথে-ঘাটে প্রায় পেয়ে থাকি। সেদিনও পেলাম।

আমাদের টাঙাচালক ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—'বাবু উস্‌কো দোঠো রুপেয়া দিজিয়ে। সব ঠিক হো যায়েগা!'

ডাঃ সেনগুপ্ত কাগজখানা লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন,—'লিজিয়ে'।

ধূর্তটা কাগজখানা হাতে নিয়ে বললে,—'ইস্‌মে আপকা সীল নেহী।

ডাঃ সেনগুপ্ত বাকি লেটারহেডগুলো ও কলম পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—'হামারা রেজিস্টারড্‌ নম্বর লিখা হ্যায়, দুনিয়াভর চলতা।'

মুখের শিকারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে লোকটা বললে —'হম্‌ ছোড়্‌ দেতা, উধার ছোড়েগা নেহি।' বলতে বলতে গর্তে মানে ছাপ্পরে ঢুকে গেল।

পরে শুনেছি লোকটা ঝোপ বুঝে কোপ মারে।

টাঙা আবার চলতে লাগলো। পাশ দিয়ে পথিক ও লরি-ট্র্যাক-মোটর এপার ওপার যাতায়াত করছে। সেতু পার হয়ে নেপাল রাজ্যের বীরগঞ্জের মাটিতে পেঁছতেই বাঁ দিক থেকে হাঁক এলো,—ক্যামেরা হ্যায়?

ডাঃ চৌধুরী জবাব দিলেন,—'হ্যায়। ইনডিয়ান'—

—'চলা যাইয়ে।'

সিরিঞ্জ হাতে কেউই এসে পথ আগলালো না। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি, নেপালী কাস্টমস্‌ হাউস। একখানা লম্বা দালানের গায়ে ইংরেজীতে লেখা—নেপাল। তার পাশে বেশ উঁচু দণ্ডের আগায় উড়ছে নেপালের পতাকা। দণ্ডের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, শাদা 'ক্রশ বেল্ট' পরা খর্বকায় নেপালী পুলিশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথটি দিয়ে টাঙা আমাদের নিয়ে চলতে লাগলো সেখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে বাস-স্ট্যানডের দিকে। মনে পড়ছে যেন পথের ডানধারেই একখানি বাড়ির মাথায় দেখলাম, মস্ত মস্ত ইংরেজী হরফে লেখা—'বীরগঞ্জ'। রাস্তার দু-পাশে ছোট-বড় কোঠা, খোলা ও টিনের ঘর-বাড়ি। পথে যান-বাহন ও লোক চলাচল কম।

বাসস্ট্যানডে পেঁছতে পেঁছতেই সাতটা বেজে পনেরো মিনিট হলো। জায়গাটি বাজারের একটি অংশ। সেখানে বাস-ট্যাক্সি-টাঙা-রিকশ-দোকানপাট - হোটেল-লোকজন চলা-ফেরা দায়। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে এসেছে পর্যটকের দল। তাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। আর এসেছে ইউরোপ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হিপি-হিপিনীরা। ওরাও চলেছে কাঠমাড়ুতে বেপরোয়া, উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতে। ওরা আমাদের ভারতের বড় বড় শহরে ছড়িয়ে থাকলেও ওদের প্রধান আড্ডা কাঠমাড়ু।

আগের দিন রকসৌল স্টেশনেই বাসের আপার ক্লাসের টিকিট কেনা ছিল ভারতীয় মুদ্রায়। নেপালেও এক টাকার দাম একশ' পয়সা। কিন্তু একশ' ভারতীয় টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় একশ' ঊনচল্লিশটি নেপালী টাকা। আমাদের এখানকার মতোই নেপালে পঞ্চাশ পয়সার বেশি মুদ্রা নেই। এক টাকা থেকে নোট আরম্ভ। নেপালী এক পয়সা কী রকম জানিনে; বোধহয় নেই। রকসৌল ও বীরগঞ্জ পোদ্দার থাকলেও আমরা ভারতীয় টাকাকে নেপালী টাকায় বদল করলাম না। তার সময়ও ছিল না। নির্দিষ্ট বাসে উঠে, নির্দিষ্ট নম্বরের আসনে গিয়ে বসলাম। সঙ্গে রইল খুব দরকারী পোশাকাদি ভরা কীট্‌ ব্যাগ বা সুটকেশ। আর সব গেল বাসের মাথায়। নেপালীরা খর্বকায়, তার ওপর পর্বতীয় পথে চলাচল করে বলেই বোধহয় বাস-গুলো লম্বায় আমাদের এখানকার মতো হলেও মাথায় খাটো। তবে ফুটবোর্ড উঁচু, দেখতে টুরিস্ট বাসের মতো। আর বোঝা নিয়ে সাত-আট হাজার ফুট উঠতে হয় বলে বাসগুলোর ইঞ্জিনও খুব শক্তিশালী। বাসে উঠে তো বসে আছি। পাশে আরও তিনখানা পর্যটক ভরা বাসের ইঞ্জিন অধীর হয়ে উঠেছে। তবু তারা আলগা পায় না। আমাদের সামনের দুখানা চেয়ার তখনও খালি। এদিকে আটটা বেজে গেল। হঠাৎ দেখি, দু জোড়া হিপি-হিপিনী উঠে এসে বসল খালি চেয়ার দু'খানাতে। অবশেষে

সাড়ে আটটার কাছাকাছি একে একে চারখানা বাস ছাড়লো। আমাদের বাস ছাড়লো সকলের শেষে। শুরু হলো আমাদের মহান-হিমগিরিপথ চলা। বাজার নগর পড়ে রইলো পিছনে। আগে যারা যাত্রা করেছে, তারা ততক্ষণে কতদূর চলে গেছে, দেখাই যায় না। সরল, মসৃণ, প্রায় পথিকহীন, প্রশস্ত রাজপথ। সমতল তরাইয়ের নানান লতা-গুল্ম-বনস্পতির ঘন অরণ্য ভেদ করে সে পথ উঠেছে হিমালয়ের গায়ে। ঘুরে-ফিরে উঠেছে চূড়ায়। আমাদের দু'পাশে তরাইয়ের গহীন বন, সরকারী বন-বিভাগ, সমুখে হিমালয়। পথের বাঁ ধারে নেপাল সরকারের পরিত্যক্ত 'ন্যারো গেজ' রেলপথ। হঠাৎ দেখি বাঁ ধারে তুষার ঢাকা কতকগুলি সাদা পর্বতচূড়া যেন ঘননীল আকাশ-পটে আঁকা। তার সামনের শৈলমালা ঘন সবুজ। আমরা চলেছি সবুজ পাথরের মাঝ দিয়ে। সে মহান দৃশ্য থেকে চোখ ফিরাতে পারলাম না।

খানিক পরে বাস পেঁছলো, নেপালের রেলপথের শেষপ্রান্ত আমলেখগঞ্জে। তরাই অঞ্চলেরও শেষ সেখানেই। শুরু হলো পর্বতের গায়ে ওঠা। গাড়ি ঘুরে-ফিরে ক্রমাগত উঠতে লাগলো—কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে, কখনও বা পিছনে হেলে। পথের দুপাশে পাহাড়ী গ্রাম। কোন বাড়ির চত্বরের কোণে বাঁশের আগায় উড়ছে সাদা নিশান, গোল মাচায় থাকে থাকে মুলো সাজানো। মাচার ওপর গোল চাল। চালের মাঝখানে চূড়া। সব মিলিয়ে দেখাচ্ছে ছোট মন্দিরের মতো; কোন বাড়িতে ছোট শস্যের গোলা; কোন বাড়ির বারান্দায় মিঠে কুমড়ো সার করে বসানো। ঘরের চালে কুমড়ো বা স্কুয়াস-লতা লতিয়ে উঠেছে। গাছ-গুলোতে ফুটেছে হলদে ফুল। নেপালের প্রধান সব্‌জি—কুমড়ো, মুলো, স্কুয়াস, ফুলকপি, আলু ও পেঁয়াজ। কিন্তু কোনটিরই স্বাদ নেই। আবার মশলাহীন রান্নার গুনে, অন্ততঃ হোটেলে, হয় অমৃতসমান ! তবে ক্ষিদের জ্বালায় মানুষ কী না খায়? নেপালীরা কুমড়ো-মুলো শুকিয়ে রাখে। এর অনেক প্রমাণ পরে দেখেছি।

পর্বতের এক জায়গায় গাড়ি পেঁছতেই দেখি, সেই পাহাড়ী গ্রামগুলো অনেক নিচে, বাতাস শুকনো ও ঠাণ্ডা। সেই তুষার-ঢাকা পাহাড়গুলো আর দেখা যায় না; চারধারে সবুজ বনে ঢাকা পর্বত, বহু নিচে উপত্যকা; নীল আকাশ পর্বত-চূড়ায় আটকা পড়ে চাঁদোয়ার মতো দেখাচ্ছে। গাড়ি উঠছে ডান ধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, বাঁ ধারে হাজার কয়েক ফুট গভীর ও চওড়া খাদ; খাদ-পথে বয়ে চলেছে অগভীর জলধারা। সে ধারা কোথা থেকে নেমে আসছে কে জানে!

গাড়ি উঠতে উঠতে পেঁছলো হেতৌড়াঁ শহরে। পথের দুপাশে ঘর-বাড়ি, দোকান-পসার, হোটেল-রেস্তোরাঁ, লোক-জন। তাদের বেশীর ভাগই নেপালী। মনে হয় বেলা তখন সাড়ে দশটা, কী তার কিছু বেশী। আগের তিনখানা বাসের দুখানা তখন পথের বাঁ ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গাড়ি গিয়ে তাদের পিছনে দাঁড়াতেই উঠে এল কয়েকটা নেপালী ছেলে। ছেলেগুলোর মুখ গোল, নাক ভোঁতা, চোখ ছোট, রং ফর্সা, মাথার চুল কদমছাঁট করা। তাদের প্রত্যেকের হাতে একছড়া করে কলা। কলাগুলো দেখতে আঁধ পাকা কাঁচকলার মতো। তারা সরু গলায় বলতে লাগলো—'কেলা। কেলা। লেও-লেও।' কিন্তু কেউই নিলে না। একজন বললেন 'কলাগুলো মিষ্টি নয়।' আমরা সকলেই নেমে গেলাম। শহরটি একখানি ছোট উপত্যকা জুড়ে গড়ে উঠেছে। চারধারে পর্বত, বাঁ ধার দিয়ে একটি জলধারা বয়ে চলেছে। তার বিস্তার সামান্য, গভীরতাও অল্প কিন্তু দুপাশে তটভূমি দেখে মনে হলো, বর্ষায় ধারাটি বিস্তৃত হয়ে দুকূল ছুঁয়ে ভীষণ বেগে বয়ে চলে। তার বুকে ছোট-বড় নানা আকারের নানা রঙের পাথর ও নুড়ি। ধারাটি সেগুলিতে বাধা পেয়ে জায়গায় জায়গায় ফেনিয়ে উঠেছে। স্থানীয় একটি লোককে জিগ্যেস করলাম, —'ঐ দরিয়ার নাম কী?'

সে বললে 'ইরামতি।'

—কোথায় মিশেছে?

'নারায়ণী নারায়ণী'—বলেই চলে গেল। কিন্তু নারায়ণী নদী উত্তর বিহারে অথবা নেপালে আজও তা ঠিক করতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের চলা আবার শুরু হলো। পথের দৃশ্যও গেল বদলে।

বাঁ দিকে নিচে পাথর বিছানো পথে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে ইরামতী। তার ওপারে পর্বত-মালা। তাদের প্রায় পাদমূল থেকে থাকে থাকে চূড়া অবধি উঠে গেছে সবুজ ধানক্ষেত্র। তার মাঝ দিয়ে চূড়া থেকে এঁকে-বেঁকে নেমে এসেছে শুকনো জলধারা পথ, যেন পায়ে চলা পথ রেখা। সেগুলো কৃষকদের তৈরী। বর্ষায় তারা চূড়া থেকে সে পথে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে জলস্রোত নামিয়ে আনে ভগীরথের গঙ্গা আনার মতো! নেপাল কৃষি-প্রধান দেশ এবং শৈল-মালা ময়। সেজন্য কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। শৈল রাজ্যটির মাঝে মাঝে মাত্র ছোট ছোট উপত্যকা ও মাল-ভূমি। সমতল ভূমি বলতে তরাই অঞ্চল। সেখানে অবশ্য চাষ আবাদ করা সহজ এবং প্রধান ফসল ধান। আর তা ফলেও প্রচুর। হঠাৎ দেখি বাঁয়ে শূন্যে 'রোপওয়ে'। তাতে ঝুলতে ঝুলতে আসছে বস্তা বোঝাই দু-তিনখানি ট্রলি। শুনলাম, কাঠমাড়ু থেকে রোপওয়েটা পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় শূন্য দিয়ে গেছে হেতৌড়া পর্যন্ত। এই পথটা বাসে প্রায় নব্বই মাইল, রোপওয়েতে মাত্র আটাশ মাইল। মনে মনে বললাম, যান্ত্রিক বিদ্যা জী,দাবাদ!' আমাদের পথের ডানদিকে সু-উচ্চ বনময় পর্বতমালা। সেগুলোরই গা বেয়ে গাড়ি উঠছে। মাঝে মাঝে দেখছি, বনের মাঝ দিয়ে, পাথরের ফাঁক দিয়ে, ওপরে বনের মাঝ দিয়ে নেমে আসছে স্বচ্ছ ফেনিল ঝরণাধারা। সেগুলো কোন্ পথে যে নিচে অদৃশ্য হচ্ছে বুঝতে পারছি না। পাথরের গায়ে জন্মেছে সবুজ মখমলের মতো শ্যাওলা ও ফাঁকে ফাঁকে ফারন এবং ছোট ছোট গাছে চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় ছোট ছোট ফুল থোকায় থোকায় ফুটে আছে। বাঁয়ে দূরে প্রকৃতির গায়ে মানুষের শ্রমে রচিত শোভা, ডাইনে প্রকৃতির গড়া সৌন্দর্য চলার পথ সুন্দর করে রেখেছে। একবার এদিকে আর বার ওদিকে তাকাই। যাত্রীদল মুগ্ধ, নির্বাক।

গাড়ি যত ওপরে উঠছে ততো কানে তালা ধরছে; কিছুই শুনতে পাই না, না ইঞ্জিনের শব্দ, না কারো কথা। গাড়ি এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে যাচ্ছে, সংকীর্ণ সেতু-পথে। একটু এদিক-ওদিক হলেই কয়েক হাজার ফুট নিচে! পথে বাঁকের পর বাঁক আসছে ডাইনে ঘুরেই বাঁয়ে, বাঁয়ে ঘুরেই আ বা র ডা ই নে, ডাইনে ঘুরেই আবার বাঁয়ে। এই ভাবে গাড়ি কোথাও নামছে বা কোথাও উঠছে। কোথাও সেতু পার হয়েই ঘুরছে বা ঘুরেই সেতুতে ঢুকছে। পথের এইসব অংশ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এপথে গাড়ি চালাতে গেলে চালকের খুব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দরকার। বাঁকের অপর ধারে পর্বতের আড়ালে কী আছে দেখা বা জানার উপায় নেই। সেজন্যে হর্ন্ বাজাতে হয়। দুবার আমাদের গাড়ি বাঁক ঘুরেই দুখানি চলন্ত গাড়ির একেবারে সামনে গিয়ে পড়লো। প্রথম বারের ঘটনার চেয়ে দ্বিতীয়বারের ঘটনাটি সাংঘাতিক। দ্বিতীয় বারের গাড়িখানি ছিল মালবোঝাই লরি। সে ছিল পাহাড়ের দিকে; আমরা ছিলাম, চার-পাঁচ হাজার ফুট গভীর খাদের কিনারে বললেই হয়। সংঘর্ষ মানেই আমাদের পাতালে পতন। দুখানা গাড়িই নিমেষে থমকে দাঁড়ালো। লরিখানা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আমাদের চালক হঠাৎ 'সুরিয়া মাইকী জয়—হা-হা-হা' বলেই ইনজিন চালিয়ে দিলে। মজা এই কোন চালকই কারো দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো না। যেন এপথে এমন ঘটনা স্বাভাবিক এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এক জায়গায় দুপাশে দুখানি খাড়া পাথর পার হয়ে যেন ফটক দিয়ে নতুন দেশে ঢুকলাম। আর সেটা নতুন দেশও বটে। বাঁ ধারে পর্বতের চূড়া থেকে চরণ অবধি যেন কাঁচা সোনায় ঢাকা—মানে ফোটা ফুলে ভরা সর্ষে ক্ষেত। তার পরেই আবার কোথাও নিচে সবুজ ধান ক্ষেত, তার ওপর সর্ষের ক্ষেতে ফোটা ফুলের সোনার হাসি। এই দৃশ্যের পরই কোন পর্বত-গাত্রের নিচে ধান-ক্ষেত, ওপরে আখ ক্ষেত। আমগাছগুলো পরস্পরের কাছ থেকে চার পাঁচ হাত তফাতে বসানো। গাছগুলোর মাথায় চামরের মতো ফুল। দূর থেকে মনে হচ্ছে, পুরা যুগের কোন মন্দিরের বারান্দায় স্তম্ভ-সারি। আর প্রত্যেকটি আবাদের মাঝ দিয়ে চূড়া থেকে নেমে এসেছে আঁকা-বাঁকা রেখা-স্রোতো পথ। গাড়ি উঠে এল সেতু পথে বোধহয় সেই ইরামতীর ওপর দিয়ে। এক জায়গায় এখানে ধারাটি কিছু চওড়া, গর্জনও কিছু গম্ভীর। আসছে বনের মাঝ দিয়ে। চালক গাড়ি থামিয়ে নামতে নামতে বললে,—'আপলোক খানা খাইয়ে।'

বেলা তখন বারোটা। সকলেই ক্ষুধার্ত। সকলেই নেমে গেলাম। পথের ধারেই হোটেল। আগেই একখানা বাস এসেছিল। দাঁড়িয়েছিল, দুখানা লরি, ট্রাক ও একখানা খরের গাড়ি। জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা, বাতাসের স্পর্শে শীত করতে লাগলো। হোটেলে ঢুকে সকলে একটু ঠেলাঠেলি করেই বেঞ্চিগুলো দখল করে বসলাম। 'কানচা-কানচী'তে অপরিচ্ছন্ন এনামেলের থালা-বাটিতে তপ্ত ধূমায়িত খানা আনলো 'চাউল-ডাল-সবজি' (ঘ্যাঁট) কাঁচা পেঁয়াজ। 'চাউল'-বাসমতী আতপ। বাংলার বাইরে সর্বত্র আতপ-চাল। যা হোক, তাই-ই সকলে দুবার-তিনবার চেয়ে নিয়ে ক্ষিদের জ্বালা জুড়ালো। কিন্তু গিলতে হলো ঠাণ্ডা জল। জানি না সে জল ইরামতীর অপরিষ্কৃত জল কিনা। তারপর আবার চলা শুরু হলো। গাড়ি ওপরে উঠতে লাগলো। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, একখানা মোটর-বাস কালো পথটি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে উঠছে, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, পাশের পর্বত চূড়ায় আস্তে আস্তে উঠছে আর একখানি 'মোটর বাস'। বাস দুখানাকে মনে হলো, যেন 'টয় মোটর'। আমাদেরও উঠতে হবে সেই চূড়াটিতে।

গাড়ি গোটা তিনেক বাঁক ঘুরতেই যেন যবনিকা সরে গেল। সামনে এক মহান দৃশ্য! দেখলাম, সারা উত্তর আকাশের কোন জুড়ে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তুষার মৌলী শৃঙ্গমালা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার গাঢ় নীল আকাশ। সমুখে বনাচ্ছন্ন পর্বত-সারি। আমরা চলেছি সোজা সেই দিকে। রৌদ্রে শৃঙ্গগুলিকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল, অত্যন্ত শাদা। আমরা সোজা সে দিকে চলতে থাকলেও তারা যে দূরে সেই দূরেই রয়ে গেল। সেই অতুলনীয় মহান সৌন্দর্য বয়স্ক যাত্রীদলকে মৌন করে দিলে; সে সুন্দর দৃশ্য স্পর্শ করলো না কেবল বরোদা থেকে আগত দুটি পরিবারের চার-পাঁচটি কিশোর-কিশোরীকে। গাড়ি বাঁকের পর বাঁক ঘুরে ক্রমাগত উঠছে: ফলে আসনে কস্ট করে বসে থাকতে হচ্ছে। তারা বসেছিল লোয়ার ক্লাসে। বাঁক ঘোরবার সময়ে তাদের এক একজন আসনচ্যুত হয়; আর অন্যেরা উল্লাসে হাততালি দেয় ও সহাস্যে চীৎকার করে। ফলে আমাদের বিরক্তি বোধ হতে লাগলো। তাদের অভিভাবকেরা কিন্তু তাতে বেশ আমোদ উপভোগ করতে লাগলেন। এই অসোয়াস্তির মধ্যে গাড়ি এসে উঠলো দামনে। জায়গাটি একটি পর্বতচূড়া। পথের ধারে ছিল একটি লম্বা বন্ধ ঘর।

তার পাশে মস্ত ফলকে লেখা—"এভারেস্ট পয়েন্ট মোটেল" অর্থাৎ পথ চলতি মোটর-যাত্রীদের জন্যে হোটেল। ঐ ঘরখানাই হোটেল। হোটেলের পাশে তিনতলা সমান উঁচু টিলা। টিলার মাথায় একটি স্তম্ভ। সিঁড়ি দিয়ে টিলার মাথায় উঠে স্তম্ভটির পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর-পূর্বদিকে তাকালে এভারেস্ট দেখা যায়। তুষার ঢাকা শৃঙ্গগুলির মধ্যে কোনটি এভারেস্ট-চূড়া মনে মনে খুঁজছিলাম। ধারণা ছিল এভারেস্ট চীন-নেপাল-সীমান্তে এবং যেখান থেকে বহু মাইল দূরে আর তার চূড়া পিরামিড-চূড়াকৃতি, সেই তুষার শৃঙ্গমালায় তাকে দেখা যাবে না। কিন্তু এখান থেকে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও চালক সেখানে বাস থামালো না; থামালো, মাইল-কতক দূরে। নেপালের পথে সর্বোচ্চ চূড়া—৬,৬৬২ ফুট উঁচু তিস্তাং দেওরালিতে উঠে। সেই শৃঙ্গমালা সেখান থেকে আরও স্পষ্ট ও আরও বিশাল দেখাতে লাগলো। তিস্তাং দেওরালিতে উঠেই খুব শীত বোধ হলো। বাতাস ছুটে আসছিলো উত্তরের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার দিক থেকে। সকলেই গায়ে গরম জামা-কাপড় চাপিয়ে নেমে

গেলেন পথের পাশে নেপালী খাবারের দোকানে তপ্ত চায়ের আশায়। কিন্তু চা পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল ঘিয়ে ভাজা চিনির রসে ফেলা 'গজা-কাম-নিমকি' জাতীয় শুকনো খাবার। মুখে দেওয়ামাত্র মনে হলো বরফের টুকরো। তার এক একখানির দাম বারো আনা। তাই খেয়ে শেষ-বেলার পড়ন্ত রোদে একটি অচীন পার্বতীয় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা পাঁচজনে ছবি তুললাম। অন্য বাসের কয়েক-জন তরুণ যাত্রী চার পাঁচটা হিপি-হিপিনীকে তাদের দলে নিয়ে ছবি তুললো। আমাদের দলেও তাদের কয়েকটাকে নেওয়ার প্রস্তাবে আমি ঘোর আপত্তি জানালাম। বললাম—'ওরা তো আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার আগ্রহ দেখায়নি। ওরা চলেছে কাঠমাড়ুতে বাউনডুলে জীবন-যাপন করতে। কে জানে 'সিয়ার' চর কিনা! ওদের দেখে আমাদের দেশের অনেক ছেলে-মেয়ের মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

● খুম্বু উপত্যকা থেকে এভারেস্ট ●

তোমাদের দাস মনোভাব আর গেল না।' মনে করলাম এতেই কাজ হলো। কিন্তু 'সাহেব-বিবির' প্রতি মোহ কী সহজে যায়? পরে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে ডঃ চৌধুরি ও তাঁর দুই মেয়ে ছবি তুলেছিলেন!

দেওরালী থেকে শুরু হলো ঘুরে ফিরে নিচে নামা। বাঁ-ধারে পার্বতগুলোর গায়ে শস্য ক্ষেতগুলোর শোভা এবার বাড়িয়ে রেখেছিল দু-একখানি করে উঁচু দো-চালা পাকা ঘর। দেখলাম ঘরগুলোকে ক্ষেতের রঙে রঙ মিলিয়ে রঙীন করা হয়েছে। কোনটা আগাগোড়া শাদা, কোনটা খানিকটা হলুদ, খানিকটা সবুজ; কোনটা লাল ও সবুজ; কোনটা বা মেটে ও সবুজ। এর ফলে দৃশ্যটাকে ফ্রেমে আঁটা এক একখানা রঙীন ছবির মতো দেখাচ্ছিল। এদিকে সামনে ও কতকটা ডাইনে শেষবেলার পড়ন্ত রোদ মাখানো নীল আকাশের গায়ে সেই তুষারঢাকা শৃঙ্গমালা। বাতাসে শীতের শীতলতা। গাড়ি যত নিচে নামে তত ক্ষেত ও ঘরের সংখ্যা বাড়ে। যেন চারধারে টাঙানো রঙীন ছবির প্রদর্শনী। তার মাঝে দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী, কে জানে তার নাম। নদীটির এপারে ওপারে দু-চারখানি করে কুঁড়ে। আরও নিচে নামতেই সেই তুষার শৃঙ্গমালা আর দেখা গেল না, দেখা যেতে লাগলো কেবল ধবধবে শাদা চার পাঁচটি চূড়াওলা মন্দিরের মতো একটি পর্বত। তার মাঝের চূড়াটি খুব উঁচু। কেউ বললেন, 'ওটা এভারেস্ট,' কেউ বললেন, 'গৌরীশঙ্কর'। পর্বতটি বহুক্ষন দেখা গেল, এদিকে সূর্য এক সময়ে পর্বতের আড়ালে সরে গেল। উপত্যকায় ও বিপরীত দিকের পর্বতগুলোর গায়ে নামলো ছায়া, এবং কাঠমাড়ু উপত্যকায় গাড়ি নামতে নামতেই হিমগিরির সেই অতুলনীয় ছবির প্রদর্শনীর ওপর সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ার যবনিকা পড়ল। গাড়ি তীব্র হেডলাইট জেবলে সমতল পথে নেপালের রাজধানী কাঠমাড়ুর দিকে ছুটতে লাগলো। তারপর শহরের কেন্দ্রস্থলে বিশাল রত্নাপারকের বিপরীত দিকে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে যখন থামলো, তখন রাত পৌনে সাতটা! প্রায় এগার ঘণ্টায় আমরা পার হলাম, একশ' আটাশ মাইল পথ। এই সুদীর্ঘ কঠিন সুন্দর পথটি নিজ ব্যয়ে তৈরী করে দিয়েছেন আমাদের ভারত সরকার। সেদিনের মতো আমাদের যাত্রা হলো শেষ। কেরলের আধিবাসী অমমাদের বন্ধু শ্রীনায়ার বাস স্ট্যান্ডে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমাদের দুজনকে নিয়ে চললেন 'বাগবাজারে' তাঁর খালি বাসায়। আর ডাঃ চৌধুরী সদলে

চলে গেলেন। শহরের একপ্রান্তে 'লজের' সন্ধানে।

নগরে নগরে

আমাদের বাংলায় তখনও হেমন্তকাল শেষ হয়নি, নেপালে শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। সেজন্য যোগ্য শীত-বস্ত্র সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ার শাস্তি সে রাতে তো বটেই পর পর ক'রাত ভোগ করতে হলো! তবু পরদিন সকালেই স্নানাদি সেরে দুজনে শহর দেখতে বার হলাম।

ছোট শহর কাঠমাড়ু সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু—একখানি ছোট উপত্যকা জুড়ে গড়ে উঠেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে হাল-ফ্যাসানের বড় বড় ইমারৎ। ফুটপাথ দিয়ে চলেছে পথচারীর দল। তাদের প্রায় সকলেই নেপালী স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা। পুরুষদের পরনে চোস্‌ত্‌ পাজামা গায়ে কামিজের ওপর কোট, মাথায় নানা ধরনের নেপালী টুপি। মেয়েদের পোশাক সাধারণতঃ অনেকটা বাঙালী মেয়েদের মতো—পরণে ছাপা শাড়ি ও সেমিজ, গায়ে হাতকাটা বা পুরো হাতা জামা, গলায় হার, কানে মাকড়ি। নেপাল বহু জাতি ও উপজাতির বাসভূমি। সেজন্য এক এক অঞ্চলের এক ভাষা, পোশাকও এক এক রকমের, গায়ের রং ও চেহারায়ও পার্থক্য। এ সব লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, কেউ কেউ খুব সাদা, কেউ কেউ তামাটে, কেউ কেউ লালচে। নেপালীরা কম ও আস্তে কথা বলে। নেপাল বহু ভাষা-ভাষী লোকের স্বদেশ হলেও জাতীয় ও সরকারী ভাষা কিন্তু নেপালী; অক্ষরগুলোও দেবনাগরী ঘেঁষা। সাধারণ মানুষ কিছু হিন্দী বোঝে কিন্তু বলতে পারে না। আবার, এমন মানুষও আছে, যারা হিন্দী বোঝেই না। এ রকম কয়েক-জনের পাল্লায় পড়লামও। আমরা কেউ কারো কথা বুঝি না, অথচ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি।

পথচারীরা ফুটপাত ধরেই চলাচল করছিল। পরে দেখেছি রাস্তা বা মোড় পার হবার সময় ছাড়া কেউ রাস্তায় নামে না। তার দরকারও হয় না। কারণ, শহরে লোক-সংখ্যা কম। গোটা নেপালেই পঁচানব্বই হাজার লোকের বাস। কোথাও ভিড় বা ঠেলাঠেলি নেই। রাজপথ দিয়ে চলাচল করছিল, নানা ধরনের সুদৃশ্য মোটর গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, লরি। চলছিল মোটর সিক্‌ল্‌, স্কুটার ও বাই-সিক্‌ল্‌। এগুলোর হ্যান্‌ডেল্‌ উঁচু হওয়ার দরুণ আরোহী-দের দেখাচ্ছিল ক্যাঙারুর মতো। গাড়িগুলোর বেশির ভাগই জাপানী। ট্যাক্সগুলোকে বিদেশীদের পক্ষে চেনা সহজ নয়। তার কোথাও 'টি' লেখা থাকে না, ছোট মিটারটিও থাকে ভেতরে ড্রাইভারের প্রায় সামনে। ট্যাক্সির চালে সামনের দিকে থাকে একটি চওড়া সাদা টান। বেলা বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথচারী ও গাড়ির সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কিন্তু কোথাও গাড়ির জটলা হলো না। আমরা যাচ্ছিলাম রত্না পার্কের সামনে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের আফিসে শ্রীনায়ারের কর্মস্থলে। তার পাশেই হাওড়া জেলার এক-জনের খাবারের দোকান। শুনলাম, ঐ দোকানটি ছাড়া গোটা কাঠমাড়ু শহরের আর কোথাও বাঙালীর খাবারের দোকান নেই এবং আর কোথাও বাঙালীর প্রিয় সন্দেশ-রসগোল্লা-জিলিপি-সিঙাড়া-কচুরি তৈরিও হয় না। দোকানে গিয়ে দেখি, বাঙালী-বিহারী-নেপালী খদ্দেরে ভরা, কোথাও বসবার একটুও ঠাঁই নেই। বিহারী-নেপালীরাও তাহলে দেখা গেল, বাংলা খাবারের রসে রসিক হয়ে উঠেছে। ঘিয়ের গন্ধে ঘরখানা ভরপুর। নেপালে ডালডার চলন নেই। অন্ততঃ আমরা দেখিনি। যাহোক, খানিক পরে আমরা বসবার ঠাঁই পেলাম এবং জলযোগান্তে যে মূল্য দিতে হলো তাতে বুঝলাম, লোকে যে বলে, 'কাঠমাড়ুতে জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল' তা সত্যি। এক পেয়ালা চায়ের দামই পঁচিশ পয়সা। কিন্তু এও জানা ছিল, নেপাল খুব গরিব দেশ। তবে কী কাঠমাড়ুতে যারা বাস করে তারা সকলেই অবস্থাপন্ন?

দোকান থেকে বেরিয়েই দেখি, ফুটপাথের পাশে দুখানি সাইকেল রিক্‌সা। যেন নানা রঙে চিত্রিত দুখানি নতুন সিংহাসন। চড়তে লোভ হলেও সংযত হলাম। কারণ, আমরা বেরিয়েছি, পায়ে হেঁটে শহর দেখতে। পায়ে হেঁটে শহরটি এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছতে দু' ঘন্টাও লাগে না। সেদিন যত পথ ঘুরলাম, টানা রিক্‌স একখানাও দেখিনি। পরে শুনেছি, টানা রিক্‌স নেই। আর শহরের উপকণ্ঠ অসমান বলে যে কোন ধরনের রিক্‌স সেখানে চালানোও সুঃসাধ্য।

শহরটি পর্বতমালা বেষ্টিত। রাস্তা পার হয়ে রত্না-পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে তুষার মৌলী পর্বত চূড়াগুলির দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম, গিরিরাজ এভারেস্টকে। কারণ, নেপাল থেকে ঘুরে গেছেন, এমন একজন বলেছিলেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঠমাড়ু শহর থেকে এভারেস্ট-চূড়া দেখা যায়। সেদিনকার আকাশ ছিল মেঘমুক্ত, রৌদ্রমাখানো। সেই চূড়ার মালায় এমন একটিকেও খুঁজে পেলাম না, যার আকার পিরামিডের মতো। হতাশ হয়ে ঢুকলাম রত্নাপার্কে। দেখলাম, পার্কে রয়েছে খেলার মাঠ, বক্তৃতা মঞ্চ, মহামান্য সরকারী অতিথি-শালা। অতিথি ভবনটির সামনে-পিছনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে চারজন করে সশস্ত্র প্রহরী! কী তাদের ভঙ্গীমা! যেন ইঙ্গিতে হুঁশিয়ার করে বলছে, তফাতে থাকো।' তবু সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সভয়ে তাকিয়ে দেখি, তারা কেউই জীবন্ত নয়, ব্রোন্‌জের মূর্তিমাত্র! পার্কের একাংশে ছিল ফুলের বাগান, ফোয়ারা ও খান কয়েক বেন্‌চি। সবই সাধারণ। তবে পার্কটি সুবিশাল এবং শহরের কেন্দ্রস্থল।

পার্ক্‌ থেকে বেরিয়ে দুজনে কতকটা অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোতে লাগলাম। এলাম নিউ রোডে। প্রশস্ত, কংক্রিট-করা পথ। মাঝখানে মোটরের সারি দাঁড়িয়েছিল; দুপাশে দোকান-পাট ও কত কী? ছিট-কাপড়ের দোকানে দোকানে পর্যটকদের ভীড়। কৌতূহলবশে কয়েকটা দোকানে ঢুকলাম। দেখলাম, পণ্যগুলো টেরিলিনের সুদৃশ্য ছাপা শাড়ি, টেরিকট-টেরিলিনাদি সুটের কাপড়, লাইটার, ফাউন-টেন পেন প্রভৃতি। এসেছে, চীন বা জাপান থেকে। ক্রেতা-দের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালি। শুনেছিলাম, ঐ সব পণ্য

ভারতে দুর্লভ এবং ওখানে দামেও সুলভ। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে বিনা শুল্কে ভারত-সীমান্ত পার হওয়া অসম্ভব প্রায়। এক কলম ছাড়া ওসবের আর কিছুতেই আমার দরকার নেই। পরে ছিলাম ধুতি-পান্‌জাবি-কোট, যে বেশে সকাল থেকে, কী পর্যটক, কী পথচারী কী বা দোকানী কারোকেই দেখি নি। ধূমপানাভ্যাসও নেই। সুতরাং রিক্তহস্তে দোকান থেকে বার হলাম। কয়েকটি দোকানের শো-কেশে দেখলাম, হরেক রকমের ক্যামেরা ও ঘড়ি। এগুলোরও বেশির ভাগেরই জন্ম নাকি চীন বা জাপানে এবং দামে কম, কাজে উত্তম। কিন্তু সীমান্ত পার হতে গেলেই চড়া শুল্কের বাধা। নেপালে তৈরী জিনিষে শুল্ক লাগে না। কিন্তু নেপালে কলে বা হাতে তৈরী উল্লেখযোগ্য কোন কিছু আছে বলে আমার জানা নেই! তবে 'কিউরিওর' কয়েকটা বড় দোকান চোখে পড়লো বটে।

পথে চলি। দেখি, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী চলেছে। তারা সহাস্য বটে কিন্তু সরব নয়। তাদের কথা না শুনলে বাঙালি বলে ভুল হয়। তবে মেয়েরা প্রায় সকলেই খর্ব। তাদের পরণে ছাপা শাড়ি, গায়ে 'কার্ডিগান', পায়ে শিলপার, হাতে বা কাঁধে ব্যাগ, সকলেই মুক্তবেণী। কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য একখানি ইংরেজীতে লেখা বইয়ের সন্ধানে বইয়ের দোকান খুঁজছিলাম। কিন্তু রাস্তাটির কোথাও বইয়ের দোকান দেখলাম না। পরে অন্যত্র বইয়ের দোকান পেয়েছিলাম বটে তবে বইখানি সে-সব দোকানে পাই নি।

ঘুরতে ঘুরতে বারোটা বেজে গেল। হোটেলের খোঁজ করতে করতে একটি গলিতে ঢুকে দুটি 'ভোজনালয়' পেলাম। যেটি 'মাড়োয়ারি সেবা সদন' পরিচালিত সেটিতেই ঢুকে পড়ে দেখি, বারান্দায় ও ঘরে 'খাদকের' ভিড়। তার মধ্যে কয়েকজন মহিলা রয়েছেন। সকলেই বাঙালি। বারান্দার এককোণে দুজনে একটু ঠাঁই করে বসলাম। ডাঃ সেনগুপ্ত উঠে গিয়ে খাবারের দাম আগাম দিয়ে দুখানা চাকতি নিয়ে এসে আবার বসলেন।

বেলা দুটোর কাছাকাছি আসন খালি হলে ভেতরে গিয়ে বসা গেল। পথে ভঁয়সাবাজারে যা জুটেছিল এখানেও জুটলো তাই। সঙ্গে দু-একটি পদ বেশি যা না থাকলেও চলে। রান্নার কথা আর কী বলবো? বাঙালিদের 'ভোজনালয়' ছাড়া আর কোথাও আমিষ-মাছ-মাংস-ডিম-মেলে না। তবে ইউরোপীয় হোটেলের কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণ অবস্থার ভারতীয় পর্যটকেরা সে সব দরজা মাড়ায় না। মাছ কলকাতা থেকে প্লেনে চালান যায় দামও অনেক। মাংসের মধ্যে 'ঠুলো খাসি' মানে মোষের মাংসের চলনই বেশি। ভেড়া ও মুরগীর মাংসের দাম খুব চড়া। আমিষ খেতে গেলে এক এক বেলাতেই লাগে দশ টাকার মতো! আর, নিরামিষে সাধারণতঃ লাগে আড়াই থেকে পাঁচ টাকা। আমাদের লাগলো তিন টাকা!

ভোজনালয় থেকে বেরিয়ে রত্নাপার্কের ধারে এসে দেখি, ফুটপাথের পাশে বসেছে দোকানপসার। বিক্রি হচ্ছে, মুরগি, তৈরী পোশাক, পট ও ছবি, পাকা-আধপাকা-কাঁচা কমলা-লেবু, পেয়ারা, পান-সিগরেট এবং আরও কত কী! তারই মধ্যে বসে আছে, গণৎকার; বাজছে, গারুড় হুইসেল, বাজছে বাজীকরের ডুগডুগি—ডুগু-ডুগু, ডুগু-ডুগু। এরা সকলেই নেপালী মেয়ে-পুরুষ-বালক-বালিকা। কেউই পথ-চারীদের পথ আগলে ফুটপাথ জুড়ে বসে নেই! তবে দোকান-পসারের সংখ্যা অল্প। স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বেলা শেষ হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় শ্রীনায়ার আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাজারের ও অন্যান্য পথে ঘুরলেন। কয়েকটি বড় বড় পথ ছাড়া সে-সব পথ স্বল্পালোকিত, সংকীর্ণ ও শ্রীহীন বোধ হলো। যত পথ সেদিন ঘুরলাম কোথাও বস্তি বা ভিক্ষুক দেখলাম না!...

পশুপতি নাথের সুপ্রাচীন মন্দির ভুবন-বিখ্যাত এবং প্রধান হিন্দু-তীর্থগুলির অন্যতম। শিবরাত্রি ও দশেরায় সেখানে লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড় হয়। দেওয়ালীতেও হয় উৎসব। এমন একটি স্থান কী না দেখে থাকা যায়? পরদিন সকালে শীত উপেক্ষা করেই স্নান সেরে তিন জনে বার হলাম মন্দিরাদি দর্শনে। নগরের প্রান্ত-সীমায় বাগমতী। ভারতে যেমন গঙ্গা, নেপালে তেমনি বাগমতী পুণ্য-তোয়া বলে গণ্য। মন্দিরটি তারই তীরে। বাগমতীর সঙ্গে কিছুদূরে মিশেছে বিষ্ণুমতী।

পৌঁছে দেখলাম, জায়গাটি অসমতল ও প্রাচীন, পথ সংকীর্ণ। তার দুপাশে বাড়িঘরের কতক সেকালের, কিছু কিছু একালের। প্রধান পথ থেকে একটি সংকীর্ণতর পথ সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে, মন্দিরের সিংহদ্বারে। প্রবেশ-পথের মুখেই বোধহয় পিতলের ফলকে ইংরেজীতে লেখা—মন্দিরে হিন্দু ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষেধ। পথের ধারে দুপাশে পুজোর ফুলের দোকান। সেখানেই পূজার্থীরা জুতো খুলে, হাত ধুয়ে ফুল কিনে মন্দিরে ঢোকে। তখন কোন পর্ব ছিল না। মন্দির ফাঁকা। কোন পাণ্ডা এসেও আমাদের পাকড়ালো না। এখানে পাণ্ডার মারফৎ পশুপতি-নাথের কাছে পৌঁছতে হয় না। ফুল হাতে সোজা চলে গিয়ে দাও পূজারীর হাতে। সে তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে প্রসাদী ফুল এনে হাতে দেবে; তারপর কপালে দেবে মস্ত চন্দনের ফোঁটা। তারপর ঘুরে দেখ মন্দির অর্থাৎ প্রদক্ষিণ কর, যা করতেই হবে। মনে হচ্ছে, কোন ঝামেলা নেই। আছে—আছে। ওখানে মর্কট বানরের পাল বাস করে। তারা পূজার্থীর হাতের ফুল কেড়ে নিয়ে মুখে পুরে চম্পট দেয়। দেখলামও কয়েকটা বানর গাঁদার পাপড়ি কুড়িয়ে নিয়ে চিবচ্ছে আর জুল্ জুল্ করে তাকাচ্ছে। একটা লোক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কয়েকটাকে তাড়িয়ে আসছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করতে করতে গিয়ে পড়লাম বাগমতীর কূলে। মন্দিরের পাদমূল ধুয়ে অপরিসর, অগভীর ধারটি ধানক্ষেতের বুক চিরে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে দক্ষিণে। বর্ষায় এই ধারাটিই ফুলে উঠে দুকূল ভাসিয়ে দেয়; মন্দির-প্রাঙ্গণও জলতলে ডুবে যায়। মন্দিরটি প্রধানতঃ কাঠ ও পাথরে গড়া. অনেকটা প্যাগোডাকৃতি; মন্দিরের দরজাগুলো রূপোর, চাল ও চূড়া সোনার। ধারাটির অপর পারে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ। বিচিত্র তার গড়ন—প্রায় চূড়ার নিচে, চারদিকে চার জোড়া পদ্ম-পলাশ চোখ, যেন বিশ্বকে

দেখছে। নেপালে বহু ধর্ম প্রচলিত থাকলেও দুটি ধর্ম, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রধান। দুই ধর্মের সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে। কারো সঙ্গে কারো বিবাদ নেই। তবে রাজা হিন্দু। রাজ্যে রাজধর্মই প্রবল হয়। যেমন রাজপথে তেমনি মন্দিরের ত্রি-সীমায় ভিক্ষুক দেখলাম না, অথচ নেপাল দরিদ্র-দেশ।

কাঠমাড়ু শহরে পর্যটকেরা সাধারণতঃ যে সব স্থান দেখেন সেসবের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। কাঠমাড়ু নতুন শহর। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিল প্রাচীন রাজাদের রাজধানী ভক্তপুর, পাটন প্রভৃতি। নগরোপান্তে হনুমান-ঢোকাও একটি পরিত্যক্ত রাজধানী।

সকালের দিকেই দুজনে বাসে চড়ে চললাম ভক্তপুর। পথে উঠতে লাগলো ছাত্র-ছাত্রীর দল। খানিক যেতে যেতেই বাসখানি ছাত্র-ছাত্রীতে ছাপিয়ে গেল। তাদের হৈ-হুল্লোড় বা চীৎকার নেই। তারা অনুচ্চকণ্ঠে, সহাস্যে কথা কইতে কইতে চললো। নেপালে শিক্ষার খুব প্রসার নেই—একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। তার নাম, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়। শুনলাম, সেটি রাজধানী থেকে বার মাইল দূরে সুন্দর পরিবেশে গড়ে উঠেছে। ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখতে যেতে পারিনি। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার যাবার পর এক জায়গায় পৌঁছতেই ছাত্র-ছাত্রীরা নেমে পথের দুপাশে বহু একর জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছোট-বড় প্রধানতঃ একতলা দালানগুলোতে ঢুকে যেতে লাগলো। দু-পাশে ইংরেজীতে লেখা সাইন বোর্ডগুলো থেকে বুঝলাম, জায়গাটি শিক্ষা-কেন্দ্র; সেখানে বৃত্তি ও শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বাস ভাড়ায় 'কন-সেসন' পায় কিনা বুঝতে পারলাম না। সেখান থেকে বসতি বা গ্রামের মাঝ দিয়ে আরও কয়েক কিলোমিটার দূরে ভক্তপুরে এসে নামলাম। যাত্রীদের মধ্যে বাঙালি মাত্র আমরা দুজন। বাসের গতিও সেই পর্যন্ত। অঞ্চলটি অসমতল—পথ-ঘাট উঁচু-নিচু, আশ-পাশে জঙ্গল, দূরে দেখা যাচ্ছিল পর্বত-মালা। বাড়ি-ঘরগুলো কাঠ-ইট-খোলা দিয়ে তৈরী, সেকেলে পথ-ঘাটের মতোই অপরিচ্ছন্ন। যেমন বাসীন্দাদের, তেমনি বাড়ি-ঘরগুলোর গায়ে দীনতার ছাপ ও শ্রীহীনতার প্রকাশ। পুরীটি ছোট, জনবিরল বললেও চলে। রাজবাড়িটি দোতলা। তার সামনে মস্ত চত্বর ও একটি তিনতলা প্যাগোডার মতো দেব-বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত মন্দির। রাজ-বাড়িটিকে করা হয়েছে যাদুঘর; দেখতে গেলে বিশ পয়সার টিকিট কাটতে হয়। শুনলাম রাজামশাই দোতলার বারান্দা থেকে দর্শন দিতেন। যাদুঘরে যে-সব ছবি ও লিপি দেখলাম, তা বেশিদিনের পুরনো ও মনে রাখবার মতো নয়। বাড়িটির অন্দরের দিকটা অযত্নে রক্ষিত। তবু পর্যটকেরা দেখতে যায়!

আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, এভারেস্ট দেখতে। পরদিন দুজনে বাসে গেলাম কাঠমাড়ু থেকে পঁয়ত্রিশ কিলো-মিটার দূরে চীন-সীমান্তে* যাবার সড়কের এক অংশে ডুলিখেলে। রাস্তায় পড়লো দুটি ছোট নতুন নগর। তাদের সব বাড়ি-ঘরই পাকা। কী তাদের নাম জানতে পারলাম না। রাস্তার দৃশ্য সুন্দর—পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে ফসল ক্ষেতে সবুজ ও সোনালি রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রঙীন করা বাড়িগুলো দেখবার মতো। বাস উঠছিল ক্ষেতগুলোর তিন-চার হাত তফাৎ দিয়ে। দেখলাম, ফোটা সর্ষে ফুলে ফুলে মৌমাছি উড়ে বসছে। ক্ষেতগুলোকে মনে হচ্ছিল, ট্রে বা লম্বা ডালায় সাজানো। আবার, এই দৃশ্যে মাঝে মাঝে দীন দরিদ্রের কুঁড়ের সারিও ছিল। এদিকে বেলা পড়ে আসছিল। মনে ভয়, বেলাবেলি পৌঁছতে না পারলে অদৃষ্টে এভারেস্ট দেখা ঘটবে না। গাড়ি প্রায় হাজার দেড়েক ফুট উঠে গিয়ে এক জায়গায় থামতেই ট্র্যাফিক পুলিশ ও বাস-চালকে লাইসেন্স নিয়ে বাধলো তুমুল বচসা। শান্তশিষ্ট নেপালী চালকটির সে কী রুদ্রমূর্তি! চালক পুলিশকে রাঙা চোখ দেখায় আর পুলিশ হাসে, এ দৃশ্য কলকাতায় কে কবে দেখেছে? চালক লাফ দিয়ে নেমে যেতেই অবস্থা এমন হলো যে, আশঙ্কা হতে লাগলো, গাড়ি বোধহয় আর যাবে না। শেষে সব মিটমাট হয়ে গেল; গাড়ি আবার উঠতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছলো ডুলিখেলে। বেলা তখন চারটে। যাত্রীদের মধ্যে মাত্র আমরা দুজন চললাম, এভারেস্ট দেখতে।

নেমে দেখি, জায়গাটি না শহর, না গ্রাম। খান কয়েক ছোট-বড় দালান ও কাঁচা বাড়ি নিয়ে বসতি। লোকজন অল্প। একটি মাত্র রাস্তা। তার এক ধার বেশ উঁচু, আর এক ধার কিছু ঢালু। রাস্তাটি ধরে এগোতে লাগলাম। কিন্তু কোথা থেকে এভারেস্ট দেখা যায়, বুঝতে পারছিলাম না, কেবল দেখছিলাম, উত্তরে দূরে বহু দূরে সাদা মেঘের মতো পাহাড়-মালা। সেখানে আসল মেঘও রয়েছে কিছু। দুজনে এগোতে এগোতে পথের দুপাশে খান কয়েক কাঁচা ও পাকা বাড়ি দেখলাম, কিন্তু এমন একজনকেও দেখলাম না, যাকে জিগ্যেস করে জানতে পারি, কোথায় দাঁড়ালে এভারেস্ট দেখা যায়। বাঁ ধারে উঁচু জায়গাটির এক অংশে ছিল একখানা একতলা কোঠা, মনে পড়ছে যেন, সেখানে উঠে গিয়ে ডাঃ সেনগুপ্ত একজনকে হদিশ জিগ্যেস করতেই তিনি বললেন, আরও এগিয়ে এই উঁচু জায়গাটার কিনারে দাঁড়ালে দেখতে পাবেন এবং তিনি আমার দিকে স-কৌতূহলে তাকাতে লাগলেন।

সেখান থেকে নেমে খানিক গিয়ে একখানি মালভূমিতে উঠে তার কিনারে গিয়ে মনে হলো যেন অনেকতলা উঁচু একখানি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছি। ছোট ছোট পাহাড় ও টিলাগুলো যেন ছোট ছোট বাড়ি-ঘর। সেগুলোর শেষে আকাশের কোলে বনে ঢাকা পর্বত-প্রাচীর। প্রাচীরের ওধারে তুষার-শৃঙ্গমালা। তিনটি শৃঙ্গকে কুণ্ডলায়িত মেঘ এক একবার সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলছে, এক একবার কিছু সরে যাচ্ছে। অনুমান করলাম, ঐ তিনটিই গৌরীশঙ্কর, মাকালু বা মাকাউ ও এভারেস্ট। কিন্তু কে বলে দেবে কোনটা কী? পিছন ফিরে দেখি, দুটি দশ-বারো বছরের নেপালী ছেলে আসছে। তাদের একজনের এক হাতে বই, অপর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কাছে ডেকে জানলাম, তারা স্থানীয় স্কুলে পড়ে। ধূমপায়ী ছেলেটিকে জিগ্যেস করলাম, 'এভারেস্ট কোনটা দেখাতে পার?'

সে সেই শৃঙ্গ তিনটির একটিকে দেখিয়ে বললে, 'ঐ-ঐ সাগরমাথা (এভারেস্ট)।'

'মাকালু?'

'ইধার—ঐ—'

'গৌরীশঙ্কর?'

'ই—ই—হুঁ—হুঁ—'

একদৃষ্টে এভারেস্টকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দৃষ্টি সার্থক হলো। মনে মনে বললাম, 'প্রণাম তোমাকে হে গিরিরাজ! ধরিত্রীমাতার অতুলনীয় সন্তান তুমি।' কিন্তু সে দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখতে পেলাম না! কুণ্ডলায়িত মেঘ বা তুষার-ঝড় তিনটি শৃঙ্গকেই ঢেকে রাখলো। (এভারেস্ট—২৯,০২৮ ফুট; মাকাউ—২৭,৮০৭; গৌরীশঙ্কর—২৩,৪৪০ ফুট উঁচু)। আর তাদের দেখতে পেলাম না! অতৃপ্ত মনে ফিরে চললাম; যেতে যেতে ছেলেটির হাতে কিছু গুঁজে দিলাম। পুণ্যকর্ম হলো যে!

ভাবলাম, পরদিন সীমান্তে দাঁড়িয়ে চীনের মাটি দেখে আসবো। কিন্তু শহরে ফিরে সীমান্তে যাতায়াতের ট্যাকসি ভাড়ার বহর শুনে সেখানে দাঁড়িয়েই গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালাম।

সেদিন শনিবার; সরকারী নিয়মে ছুটির দিন—রবিবার থেকে কর্ম-দিবস শুরু হয়। আমাদেরও 'শেষ রজনী'—রবিবার সকালেই স্বদেশের দিকে যাত্রা শুরু হবে। শ্রীনায়ারের নেতৃত্বে সকালেই বাসে চড়ে দুজনে চললাম, মল্লরাজাদের আর এক পরিত্যক্ত রাজধানী শহর থেকে মাইল কতক দূরে, পাটনে। পৌঁছে দেখি, অনেকটা ভক্তপুরের মতো, তবে আয়তনে অনেক বড়, পথঘাট কিছু চওড়া ও পরিষ্কার, লোকজন কিছু বেশি; এদিকে-ওদিকে দেকান-পসার। রাজ-বাড়িটি ত্রি-তলা। তার সামনে প্যাগোডার মতো উঁচু শূন্য মন্দির। রাজবাড়িটির দ্বিতলে-ত্রিতলে যাদুঘর। সেখানে পুরনো দিনের কাপড়ে আঁকা ছবি, মূর্তি প্রভৃতি ও প্রায় আড়াই হাজার বছরের আগেরও পোড়ামাটির মূর্তির ভগ্নাবশেষ সযত্নে রক্ষিত। এই সুপ্রাচীন মূল্যবান জিনিস-গুলির একটির বয়স খ্রীঃ পূঃ ছয়শ' বছর—মানে গৌতম বুদ্ধেরও আবির্ভাবের আগের। এগুলি আনা হয়েছে, নেপালের দক্ষিণ-পশ্চিমের তরাইয়ের লুম্বিনী ও কপিলা-বস্তুর মাটি খুঁড়ে। শ্রাবস্তী, লুম্বনী ও কপিলাবাস্তু তো নেপারেলই নগর—আজও আছে। দেখবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও ঐ টুকরোগুলোকেই পবিত্র জ্ঞানে মনে মনে নমস্কার জানালাম। ওসব তো মনে আছেই, আর মনে আছে শেষ মল্লরাজার ভাঙা, রংচটা সোনালি সিংহাসনখানিকে! নিচের তলায় খুপরি-ঘরের সারি; সেগুলোর সমুখভাগ সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের। নেপালে কাঠ, পাথর ও পাতলা ইটে তৈরী সেকালের ইমারৎগুলি কতকটা প্যাগোডা-কৃতি। ঘরগুলোর সামনে তিনধারে টানা বারান্দা। এই সব ঘরে কারা থাকতো, কী হোত কে জানে! তবে বোঝা গেল, এটা ছিল অন্দরমহল। কিন্তু প্রকাণ্ড আঙিনার কোথাও জলের ব্যবস্থা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। অন্দরের পিছনে ফুলের বাগান। সেখানে দাঁড়ালে দূর দিগন্তের তুষার-শৃঙ্গমালা দেখা যায়। পাটনের পরিবেশ যে মনোরম তা বলতে পারি না। নগরটি থেকে বেরিয়ে আসবার পথে দেওয়ালের গায়ে দেখি মস্ত ফলকে ইংরেজীতে লেখা—পাটন ঢোকা।

কাঠমাড়ুতে ফিরে এসে দুপুরের কিছু পরে বাসে চড়ে তিনজনে শহরের বাইরে দেখতে গেলাম 'বালাজু গারডেন।' কারণ পর্যটকেরা গিয়ে থাকেন। বাগানের মধ্যে মনে রাখবার মতো তার পুকুরের ক্রীড়াশীল বড় বড় মাছগুলি—ওজনে কোন কোনটা দেড়-দুই কে. জি. হবে; দেখতে কোনটা রুইয়ের, কোনটা কাৎলার, কোনটা পারশে বা মহাশোলের মতো; গায়ের রং নীল, হালকা কমলা বা ফিকে সবুজ। একটা ভেসে উঠে যেমনি ঘাই দিচ্ছে অমনি সবগুলো ভেসে উঠছে; আবার একটা যেমনি হুট করে ডুব দিচ্ছে অমনি সবগুলো তলায় অদৃশ্য হচ্ছে। বাগানখানির তিনদিকে গভীর বনে ঢাকা পাহাড়। একদিকের পাহাড় তো বাগানের সেদিককার সীমানা। বাগান-সংলগ্ন একটি সুইমিং পুল আছে। সেই ঠাণ্ডাতেও কেউ কেউ পুকুরে সাবান মেখে স্নান করছিল। শুনলাম, শহরের 'বিলাসী সম্প্রদায়' ও হিপি-হিপিনীরা পয়সা দিয়ে 'পুলে' স্নান করতে যায়। দেখলামও কয়েকটি তরুণী স্নান করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

শহরে ফিরতে ফিরতেই সন্ধ্যা নামলো। বাস থেকে নেমেই হাঁটতে হাঁটতে চললাম, প্রাচীন রাজধানী, হনুমান ঢোকার দিকে। বাজারের মধ্য দিয়ে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সাতটা। জায়গাটি স্বল্পালোকিত ও গলিময়, বাড়ি-ঘরগুলো সেকালের, পথে লোক চলাচল খুব অল্প। পথের এক জায়গায় একটা পুরনো বট; তার পাশে হনুমানের বিরাট, বিকট মূর্তি। এইখানেই আছে কাল ভৈরব; আছে পরিত্যক্ত রাজবাড়ি। সিকি শতাব্দী আগেও এখানে নরবলি হোত। ভক্ত বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবার সময়ে খড়্গাঘাতে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত; হরভাগ্যের রক্ত বয়ে যেত নালা পথে। এই নৃশংস, অর্থহীনপ্রথা রহিত হয় এক নেপালী যুবকের বুদ্ধি কৌশলে ও জনমতের চাপে। এখন হয় হাজার মোষ বলি, তার মধ্যেও নিষ্ঠুর বৈশিষ্ট্য! মোষটির দেহে বার বার তলোয়ারবিদ্ধ করে—না থাক সে কথা। দু'লরি বোঝাই মোষের শিঙ নেপালে যাবার পথে আমাদের ভারতের দিকে আসতে দেখেছিলাম বটে।

নেপালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সিংহাসন নিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই হয়েছে। প্রজারাও রাজভক্ত—বাসে, ট্যাক্সিতে, হোটেলে, দোকানে, কোটের কলারেও রাজা-রানী বা রাজা-মশাইয়ের মূর্তি; পথের ধারে লেখা 'লং লিভ্ দি কিং' আসতে আসতে পথের পাশে একটি রেডিওতে একটি শিশুকে দু'বার বলতে শুনলাম.....'রাজা বীরেন্দ্র'। যেন পাখি পড়ছে। নেপালের বর্তমান রাজার নাম—বীরেন্দ্র।

রাতে বাসায় ফেরার পথে বাসের আপার ক্লাসের দুখানা টিকিট কিনে নিলাম। ফিরতি পথে ভাড়া প্রতি টিকিটে তিন টাকা ষাট পয়সা কম। কারণ, গাড়ি দেওরালির পর থেকে চড়ায় চড়ায় নিচে নামবে; ফলে তেল পুড়বে কম। সকাল আটটা থেকে, তখন রাত আটটা পর্যন্ত পথচলায় দেহ

ক্লান্তি। তার ওপর মন অতৃপ্ত। বার বার মনে হতে লাগলো, হিমালয়ের বুকে নেপাল, মহান পার্বতীয় সৌন্দর্যে ভরা, সেখানে এসেও দেখলাম সামান্যই। হেলামবু, পোখরা, প্রায় তেরো হাজার ফুট ওপরে হ্রদ গোঁসাই কুন্ডা, অন্নপূর্ণা শৃংগ, শেরপাগ্রাম—কত কী বাকি রইলো! আর কী কখন আসবো? তবে এসব অনেকটা দূরে দূরে—যাওয়া ব্যয়, শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। চলতে চলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘাচ্ছন্ন এবং পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় যখন বাস থেকে রওনা হলাম, তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরছে, হিমেল, সজল পার্বতীয় হাওয়া বইছে এলোমেলো।

ফেরার পথে

স্ট্যানডে পেঁছে দেখি, দু-তিনখানি বাস যাত্রী নিয়ে পর পর দাঁড়িয়ে আছে। আর একখানি রওনা হলো।

শ্রীনায়ার বিদায় দিতে এসেছিলেন। তাঁকে বললাম, 'শুনেছি, কাগজেও পড়েছি, বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধ্বস নামে। তার ফলে যাত্রীসমেত বাস খাদে পড়ে যায়।'

● বরফে ঢাকা হেলাম্বুর একটি দৃশ্য ●

তিনি বললেন, 'এমন ঘটে সাধারণতঃ বর্ষাকালে। এ বৃষ্টি প্রবল নয়।'

—'সেই যা ভরসা। তবে দুর্ঘটনার কথা কে বলতে পারে!'

তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ব্যথিত, কম্পিত বুকে এই সজ্জনটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসে উঠে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম। হুঙ্কার দিয়ে বাস চলা শুরু করলো। মনে মনে বললাম, 'বিদায় কাঠমাড়ু। এসেছিলাম, রাতের অন্ধকারে, ছেড়ে যাচ্ছি মেঘের কালোছায়ায়।'

গাড়ি শহর থেকে শহরতলী, শহরতলী থেকে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। আসবার দিনের পথের সে দৃশ্য আর নেই। গাড়ির কাচের জানলার গায়ে জল, উইন্ডগ্লাসে জল, চাল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। বাইরে ঝিরি ঝিরি জল। নীচে উপত্যকায়, পাহাড়ের গায়ে গাঢ় মেঘ, চূড়ায় হালকা মেঘের আস্তরণ, আকাশ ফাঁকা, পথ পিছল; শুষ্ক বা নির্জীব ঝরনাগুলো জেগে উঠে বহু ধারায় নীচে নেমে আসছে। হিমেল উত্তরে হাওয়ায় অরণ্যানী দুলছে। এক একবার নীচের মেঘ উঠে এসে আমাদের ঘিরে ধরে। কিন্তু আমাদের গাড়ির চালক শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে, তীক্ষ্ন, স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে সেই বন্ধুর পিছল পর্বতীয় পথে গাড়ি চালাতে লাগলো। সে পথের সবই যেন তার কণ্ঠস্থ। তবু ভুলও তো হতে পারে? একবার আমাদের পিছনের আসনে কারা গোলমাল করে উঠতেই সে ধমক দিলে, 'হল্লা মাৎ করিয়ে।' অমনি সব চুপ! একটু অমনোযোগী হলে আর রক্ষা নেই। তার দায়িত্ব কত! গাড়ি দেওরালি চূড়ায় উঠে, খানিক বিশ্রাম নিলে। তখন বেলা বারোটা হবে। বৃষ্টি ঝরছে সমানে। সেখানে সেই খাবারের দোকানে নীচের তলায় ভিজতে ভিজতে নেমে গিয়ে অপরিচ্ছন্ন পুরনো এনামেলের বাসনপত্র তপ্ত 'চাউল-ডাল-সব্জি' গিলে সেই শীতে একটু আরাম বোধ করলাম।

আবার চলা শুরু হলো। আমাদের চলার যদি মাঝে মাঝে বিরাম ঘটে বৃষ্টির বিরাম নেই। সেই আগের স্থানগুলি একে একে পার হলাম। চোখে পড়লো সর্ব-সমেত ছোট-বড় বারোটি ঝরনা। অবশেষে বেলা চারটেয় নেমে এলাম তরাইয়ে—আমলেখগঞ্জে। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যে পেঁছলাম বীর-গঞ্জে তখন বৃষ্টি পড়ছে জোরে। বাস থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে টাঙায় উঠতেই এলো কাস্টমসের পুলিশ। তাদের থাবা এড়িয়ে সীমান্ত পারে রকসৌলে এসেও নিস্তার পেলাম না। ভারতীয় পুলিশ আবার পকেট হাতড়াতে লাগলো, সুটকেসাদি পরীক্ষা করলো। তারপর রকসৌল স্টেশনে এসে ওয়েটিংরুমে আশ্রয় নিলাম।

শীঘ্র সমস্তিপুর পেঁছবার আশায় পরদিন সকালে দুজনে মজফ্ফরপুরের পথ ধরলাম। তখন আকাশ পরিষ্কার, রোদে সব ঝলমল করছে। একটি স্টেশনে গাড়ি পেঁছতেই আবার পুলিশ এসে বললে, 'আপনার সুটকেশ খুলবো।'

পকেট থেকে চাবি বার করে বললাম, 'বেশ, খুলুন।' কী জানি কী ভেবে তারা আমাদের মুক্তি দিলে। তখন গাড়ি একটি অপরিসর নদীর সেতু পার হচ্ছিল। পুলিশটিকে জিগ্যেস করলাম, 'দরিয়াটির কী নাম?'

বললে, 'গন্ডক।'

সমস্তিপুরে পেঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলাম, ডাঃ চৌধুরীরা অন্য পথে বাসে আগেই পেঁছে গেছেন। ওঁরা গিয়েছিলেন, জনকপুরে মন্দির দেখতে। তারপর—কিন্তু তারপরের গল্প আর লিখে কী হবে?

কি বিপদ !! • প্রদীপকুমার রায়

সকালবেলাই হবু রাজার
উজিরে আর নাজিরে
কড়া তলব পেয়ে দিলেন
রাজার কাছে হাজিরে।
পেঁছে করেন মস্তো সেলাম—
ঘাটতি নেই সে গুণে,
হায়রে! তবু রাজা মশাই
জ্বলেন তেলে বেগুনে।
বলেন তেড়ে, "তোদের আমি
চাকরী খাবো আজই রে!"
পয়সাকড়ি দুজন মিলে
লুটছো কেবল দু' হাতে,
হুঁশ কারো নেই রাজ্যটা যে
ফাঁক করে দেয় 'চুহা'তে?
জাবদা খাতা, বই পত্তর,
গদি বালিশ বিছানা,
সব কিছু আজ ফেলল কেটে,
বাপ্! কি কড়া নিশানা!
কুচি কুচি করলো কেটে
পাঁচ বছরের পাজী রে!
ফেলল কেটে খাগের কলম,
কাটলো তালের পাখাটা;
বাড়িয়ে কথা লাভ কি আছে—
কোন্‌টা আছে না কাটা?
বাক্‌সো কাটে, ডেক্‌সো কাটে,
বাড়ছে ক্ষতির তালিকা,
ভুঁড়ির চুলও নিচ্ছে কেটে
একলা পেলে খালি গা!
কেমন করে ইঁদুরগুলোর
ঠেকাবো কারসাজি রে!
ঘুমিয়েছিলাম অঘোর ঘুমে
কালকে রাত্রি দুপুরে,
স্বপ্নে দেখি কি সব যেন
নড়ছে বুকের উপুরে।
চম্‌কে দেখি সব্বোনাশের
পা পড়েছে মাথাতে,
চুল দাড়ি সব টুকরো হয়ে
ছড়িয়ে আছে কাঁথাতে!
এখন আমি রাজার বেশে
কেমন করে সাজিরে!!"

নীল পরী • গোবিন্দ গোস্বামী

নীল পরী নীল পরী,
যাচ্ছো তুমি কাদের বাড়ি?
নিচ্ছি তুলে সেই যে আড়ি
একটু বসে আমার পাশে
গল্প তুমি করো না!

নীল পরী নীল পরী,
ক্ষীরের পাহাড় দুধের নদী
পেরিয়ে এখন এলেই যদি
সে সব দেশের খবর কিছু
একটু তুমি বলো না!

নীল পরী নীল পরী,
সোনার ধুলো রুপোর কাদা
পথের মাঝে কতোই বাধা
জোছনা-মাখা পিদিম জেবলে
আমায় নিয়ে চলো না!

নীল পরী নীল পরী,
মেঘলা দিন ঝড়ের রাত
ছুটিয়ে ঘোড়া থেমে হঠাৎ
এগিয়ে চলার স্বপ্ন যতো
আমার কাছে ধরো না!!

ছড়া • করুণাময় বসু

কাঁদছ কেন তুতুল, বুতুল?
কে ভেঙেছে কাঠের পুতুল?
দেখবে যদি ঝুর-ঝুর-ঝুর
ঝরতে থাকা মুক্তো মানিক পান্না,
আপাতত থামাও তবে কান্না।
আসতে হবে পূর্ণিমাতে
ভরা দুপুর জ্যোৎস্না রাতে,
ঝাঁকড়া-মাথা বন পেরিয়ে,
ময়নামতী গাঁ এড়িয়ে
নাম-না-জানা নদীর ধারে,—
জলের পাড়ে একটা বকুল গাছ ঃ
নদীর ঢেউয়ে দুলতে থাকে
রুপ-রুপোলী পান্না চুনির মাছ।
আবার কখন মেঘের দেশের
লাল পরীদের, নীল পরীদের নাচ।
মোহর গিনি ঝিলমিলিয়ে
জ্যোৎস্না হয়ে যায় মিলিয়ে,
ঝুর-ঝুর-ঝুর ঝরতে থাকে।
মুক্তো মানিক পান্না ঃ
আঁজলা ভরে কুড়িয়ে নেবে?
খোঁজ করগে নদীর খবর,
ঢের বলেছি, আর না।

কিশোর • শৈলেন দত্ত

ঐ যে ভ্রমর গুনগুনিয়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে
ঐ যে প্রজাপতির পাখায় বর্ণ ওঠে দুলে
ঐ যে বাতাস এলোমেলো
বকুল-গন্ধ নিয়ে এলো
ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, নৃত্যে মাতায় শাল-পিয়ালের বন,—
সেই তো তোমার মন,
কিশোর, সেই তো তোমার মন!

বেলাশেষের মাঠে যখন নেমেছে অম্লান
গন্ধে মাতায় ঘরে ঘরে পাকা সোনার ধান।
ঘরে-ফেরা রাখাল-বাঁশী
ফোটায় সন্ধ্যাতারার হাসি—
আলোকে আর আনন্দে দেয় ভরে আকাশ-কোণ,—
সেই তো তোমার মন,
কিশোর, সেই তো তোমার মন!

ক্লান্ত ধূসর ধরায় যখন নামে শাওন-বান
কিষান মেয়ের কণ্ঠে শুনি হারিয়ে-যাওয়া গান।
ভেঙে কালো মেঘের কলস
জাগে ধরা নিঝুম অলস
তরুলতা হাজার কথায় খুশিতে আটখান
সেই তো তোমার প্রাণ,
কিশোর, সেই তো তোমার প্রাণ!

সাগর মোছায় স্নেহের ধারায় মরুর দীর্ঘশ্বাস
পত্রে পুষ্পে দেয় ছড়িয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।
ঊষর মরু কান্না ভুলি
ঊর্ধে সবুজ কেতন তুলি
হাসি ছড়ায়, দেয় বিছিয়ে শ্যামল আঁচলখান—
সেই তো তোমার প্রাণ,
কিশোর, সেই তো তোমার প্রাণ!

আমার ছড়া • প্রবাস দত্ত

আমার ছড়া ছড়িয়ে আছে মনে,—
এইখানে, দূর শাল-পলাশের বনে।

ভোরের পাখি কিংবা রাতের ফুল
মেঘলা দিনের মন-কেমন বকুল
একটি জোনাক কিংবা ঘুমের পরী—
সব কিছুতেই ছড়ার ছড়াছড়ি।

ছোট্ট খোকা দিচ্ছে যখন হামা
ফোক্‌লা মুখে বলছে ডেকে 'মা-মা'
কিংবা হঠাৎ খিলখিলিয়ে হাসে,
এই পৃথিবী হাজার ছড়ায় ভাসে।

হাতড়ে মরে কে আর ছড়া তবে
ভুবন-জোড়া ছড়ার উৎসবে!

মিল-অমিল • শৈবাল চক্রবর্তী

ছবি আঁকার নেই কো তুলি,
হাতে কলম নিয়ে,
ভাবছি বসে কিসের সঙ্গে
মেলাই যে কি দিয়ে।

মিল খুঁজে পাই দুষ্টু মেয়ের
নৃত্যে খেয়ালভরে,
পাহাড় থেকে ঝরনা ঠিকই
নামে তেমন করে।

শরৎকালের শুভ্রমেঘের
পাহাড় ভালবাসি,
অবাক দেখে তেমনি সাদা
কাশের বনের হাসি।

যেমন লাল হয় সূর্যিমামা
অস্ত গেলে পরে,
তেমনি লাল ওই হাজার ফুলের
হাসির মধ্যে ঝরে!

সাগরে যে নীলের জোয়ার
মেঘেও সে নীল থাকে,
স্বপ্ন যখন পাখা মেলে
পাখিই বলি তাকে।

রংয়ে, রেখায় এই যে দেখি,
হাজার মিলের মেলা,
লক্ষ শিশুর মন ভোলাতে
এ একজনের খেলা॥

হিজিবিজি • তপনকুমার চৌধুরী

বুবুর হাতে কাকুর কলম,
কাজেই এখন তার
লেখা ছেড়ে কথা বলার
নেই কো সময় আর।

হিজিবিজি লিখছে খাতায়
আসছে মাথায় যা-যা,
আজকে বুবু সত্যি কিন্তু
মস্ত লেখার রাজা।

কাকু এসে অবাক হবেন
কাণ্ড দেখে তার,
হিজিবিজি লিখতে দেখে
দেবেন নাকি মার?

হিজিবিজি সত্যি বটে
বুঝবে কী তার মানে?
আজ যে কুঁড়ি কালকে সে ফুল
এ তো সবাই জানে।

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও কালো বিড়াল

কলকাতার কাছে এক শহরতলিতে এসেছেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী। কেন? তা কেউ জানে না। একদিন ঐ এলাকাতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা পোড়োবাড়ীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন ত্রিবেদী। তিনি তন্ময় হয়ে বাড়ীটা পর্যবেক্ষণ করছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাঁকে জানাল ঐ বাড়ীটি নাকি হানাবাড়ী, অর্থাৎ 'ভূতের বাড়ী'। ত্রিবেদী বললেন ভূত বলে কিছু নেই এবং গোবিন্দকে নিয়ে হানাবাড়ীতে একটি রাত কাটিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন ভূতের ব্যাপারটা নিতান্তই গুজব ...

গোবিন্দ! সারা রাত এখানে রইলাম, কিন্তু ভূতের দেখা পেলাম না। আসলে ভূত বলে কিছু নেই, — বুঝেছ?

হ্যাঁ, স্যার।

তোমাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিলাম, এবার আমি চলি। বিছানা-বালিশ বাড়ী নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না তো গোবিন্দ?

কি যে বলেন স্যার! এগুলো তো আমিই নিয়ে এসেছি।

ঠিক! ঠিক! আমার মনেই ছিল না। আচ্ছা, এবার তুমি বাড়ী যাও, আমিও বাড়ী যাই।

ত্রিবেদী স্যার যে বাড়ীতে ভর্তা নিয়ে রয়েছেন সেটা তো আমি চিনি। উনি তো সেখানে গেলেন না! দেখলাম ঐ হানাবাড়ীর দিকেই উনি গেলেন! কাল ও ঐ বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে উনি তাকিয়েছিলেন ... কেন? ওখানে কি আছে? কোন গুপ্তধনের — আরে! বেড়াল-কুকুরের ঝগড়ার শব্দ!...

ভোক্! ভোক্!

ফ্যাস্!

উঃ! বগলুর হতচ্ছাড়া কুকুরটা একটা কালো বেড়ালকে কোণঠাসা করেছে!

হেট! হেট!... আরে ব্যাটা আমাকেই কামড়াবে নাকি?

গরর!

এই গোবিন্দ! আমার কুকুরের পিছনে লাগছিস কেন রে?

S.N. 2/1

তোর কুকুর ঐ বেড়ালটাকে কামড়াতে যাচ্ছিল, তাই তাড়া দিচ্ছিলাম।
বেড়াল?
বেড়াল কোথায়? ... ঐযে! ... যা, যা, জিম, ধর্ ওটাকে!
ঈস্! কুকুর ছেড়ে দিলি? ধরতে পারলে বেড়ালটাকে মেরে ফেলবে। তোর কুকুর এপাড়ার দু'তিনটে বেড়াল মেরেছে।
এটাকেও মারবে। ঐ দ্যাখ্...
কোথায় পালাবে? জিম ওকে ঠিক ধরে ফেলবে।
ভোক্! ভোক্!
ভোক্! ভোক্!
এঃ হে! কাজের সময় যত গোলমাল - সনাতন!
ভোক্! ভোক্!
সনাতন! এই সনাতন! বাড়ীর সামনে একটা কুকুর ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছে। মেরে বিদায় কর ওটাকে। স্থির হয়ে কাজ করার উপায় নেই।
কুকুরের তাড়া খেয়ে জানলা দিয়ে একটা বেড়াল ঘরে ঢুকেছে। তাই কুকুরটা চ্যাঁচাচ্ছে। এখন আপনাকে কাজ করতে হবেক নি, বেলা হয়েছে খেতে চলেন।
আচ্ছা, আচ্ছা, এখনই যাচ্ছি।
তাড়াতাড়ি আসুন। আমি আপনার খাবার দিচ্ছি।
এইবার টপ্ করে এটা খেয়ে ফেলি...
জাপানী প্রফেসর তাগাগাকি বুবুসোনা যে ফরমুলা দিয়েছেন, তার সূত্র অনুসারেই তো মিকশ্চার তৈরী করেছি। যে নমুনা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, হানা-বাড়ীতে ঠিক সেই বস্তুটি পেয়েছি মনে হচ্ছে। তাগাগাকি বলেছেন পনের মিনিট পরেই ফল পাওয়া যায়। আমি না হয় আধঘন্টা অপেক্ষা করব।
S.N.2/2

নাঃ! আর পারি না বাপু - কাজ থাকলে তো ফল-মিষ্টি আর দুধ ছাড়া কিছুই খাবে না — তাও যদি ...
তাও যদি ঠিক সময়ে খায়... খাবার টেবিলে আবার কতকগুলো গাছের পাতা রেখে গেছে।
এইবার খেয়ে নি। এরপর আর খাওয়ার সময় পাব কি না সন্দেহ।
সনাতন! খেতে দে।
অনেকক্ষণ দিয়েছি।
সনাতন, তুই এইবার খেয়ে নে। আমি শুধু ফল মিষ্টি আর দুধ খাচ্ছি, পরিবেষণের ঝামেলা নেই। তুই খেতে যা, অনেকবেলা হল। তোর খাওয়া হলে চিঠির বাক্সটা দেখবি। চিঠি আসতে পারে।
আচ্ছা বাবু।
আধঘন্টা হয়ে গেছে। সনাতনও খেতে গেল, এখন একবার পরখ করি...
একি হল! টেবিলটা একটুও নড়াতে পারলাম না! কিন্তু প্রফেসর তাগাগাকির নথুনো তো এইরকমই ছিল মনে হয়...
ফরমুলা মিলিয়েই তো সব করেছি — তবে? নোটবইটা প্যান্টের পকেটেই রয়েছে, খেতে খেতে বরং আর একবার ফরমুলাটা দেখি ... সব তো ঠিকই আছে দেখছি... তবে কি এটা আসল জিনিস নয়? তাগাগাকি বলছিলেন যদিও আমাজন নদীর অববাহিকায় এই জিনিস তিনি পেয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজায়গায়...
কয়েকজায়গায় ঐ ধরনের গাছ তাঁর চোখে পড়েছে; তবে ওগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ —
থুঃ! থু! থু!
অন্যমনস্ক হয়ে খেতে খেতে খাবারের বদলে একটা পাতা মুখে দিয়ে ফেলেছি - কি তেতো রে বাবা! উঃ! ... ঐ যাঃ!...
ঐ যাঃ! হাতের ধাক্কা লেগে দুধের গেলাস উল্টে গেল!
আরে! একটা কালো বেড়াল এসে জুটেছে! ওহো! সনাতন বলছিল বটে, একটু আগে কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা বেড়াল জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ... বেড়ালটা দুধ খাচ্ছে... থাক... আমি বরং একটু বিশ্রাম করি - মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ।
S.N.2/3

প্রশ্ন সেটাই : কতক্ষণ স্থায়ী ঐ আশ্চর্য পাতার শক্তি?

আগামী সংখ্যায়

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও বাঘা মুকুন্দ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

সাদা ঘোড়ার সওয়ার

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

৯

ধূমঘাট নাম আজ সার্থক

সত্যিই সেখানে ধুম লেগেছে উৎসবের। গাঙের পাড়ে অন্তত ক্রোশখানেক ধরে লোকে লোকারণ্য।

ধূমঘাট যশোর-রাজ্যের রাজধানী। এমনিতেই সারা বছর মানুষ-জন, ডুলি-পালকি, গোরুর গাড়ি, ঘোড়-সওয়ারে গমগম করে। কত মুলুকের কত রকম মানুষ আর পোশাকই সেখানে না দেখা যায়! গরিব বড়লোক দেশী মানুষ তো আছেই, তার উপর আছে রাজপুত, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গি, হাবসী। তাদের যেমন নানান ধরনের চেহারা তেমনি নানা রকমারি পোশাকের বাহার।

কিন্তু সাধারণ অবস্থায় রাজধানীতে যত লোকই থাক তারা সবাই জড়ো হয়েও এমন ভিড় জমাতে পারত না। এ-ভিড় যুদ্ধের তোড়জোড়ে দূর-দূরান্তরের সৈন্য আর মানুষ ধূমঘাটে এসে জড়ো হওয়ায় জমেছে।

গাঙের পাড়ে সত্যিই যেন মেলা বসে গেছে। শহরের লোক তো বটেই, কাছাকাছি সব গাঁয়ের লোকও শুধু মজা দেখতে আসেনি। কেউ-কেউ ওরই মধ্যে দু-চার পয়সা কামিয়ে নেবার ব্যবস্থাও করেছে। কেউ মুড়ি-মুড়কি, মোয়া মঠ তালপাতার চাটাই-এ ঢেলে বেচছে, কেউ সুবিধেমতো জায়গা বেছে নিয়ে তেলে-ভাজার কড়া চাপিয়েছে কাঠের আগুনে। সবচেয়ে বুদ্ধি করেছে বুঝি একজন ফেরিওয়ালা। বাঁকারির তলোয়ার তৈরি করে তার ডগায় শোলা দিয়ে সে একটা মুণ্ডু-গোছের বানিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। তলোয়ারের ডগার দিকে একটু লাল রং লাগানো, আর শোলার টুকরোটা খুব কল্পনা খাটালে মোগল সেপাই-এর মুণ্ডু বলে ভাবা যায়।

বিক্রী হোক না হোক ভিড় এই ফেরিওয়ালার চারিধারেই বেশি।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে একজন তীরন্দাজ ধমক দিয়ে কাকে যেন ঠেলে দিয়ে বলে,—'তুই বেটা ঘেসুড়ে এখানে কী দেখছিস! এ ঘাস কাটা নয়, মাথা কাটার খেলা!'

কাছাকাছি ক-জন হেসে ওঠে। মাথায় ঘাসের বোঝা বওয়া ঘেসুড়ে ছোকরা যেন অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ায় একটু। কিন্তু বেশি দূরে সে যায় না।

যে তাকে ধমক দিয়েছে তেমন হুঁশিয়ার থাকলেও বোধহয় সে তীরন্দাজ বুঝতে পারত না যে, ঘাসের বোঝায় মুখটা প্রায় ঢাকাপড়া, খাটো, হাঁটু অবধি ময়লা কাপড়-পরা, ধুলো-কাদা-মাখা এক ছোকরা ধূম-ঘাটে আসা অবধি সারাক্ষণ তার আশেপাশেই ঘুরছে। তীরন্দাজের হুঁশিয়ারি অবশ্য কিছু কম ছিল না, কিন্তু সে অন্য দিকে। আর কোনো তীরন্দাজের কাছা-কাছি না-গিয়ে পড়ে এইটুকুই শুধু তার লক্ষ্য। সে-লক্ষ্য নিয়েই এদিক ওদিক সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিছু খেয়াল করবার কথা তার মাথাতেই আসেনি।

এ-তীরন্দাজ অবশ্য আর-কেউ নয়, সেই সদানন্দ —ভাঙা মন্দিরে শেখর রূপরামের সঙ্গে যার ষড়যন্ত্রের আলাপ শুনেছিল।

ছোকরা ঘেসুড়ে যে স্বয়ং শেখর তা বোধহয় আর বলে দেবার দরকার নেই।

শেখর শেষ পর্যন্ত তার আগের ফন্দি অনুসারে ঘেসুড়ে সেজেই ধূমঘাটে ঢুকেছে। ভাঙা মন্দিরের

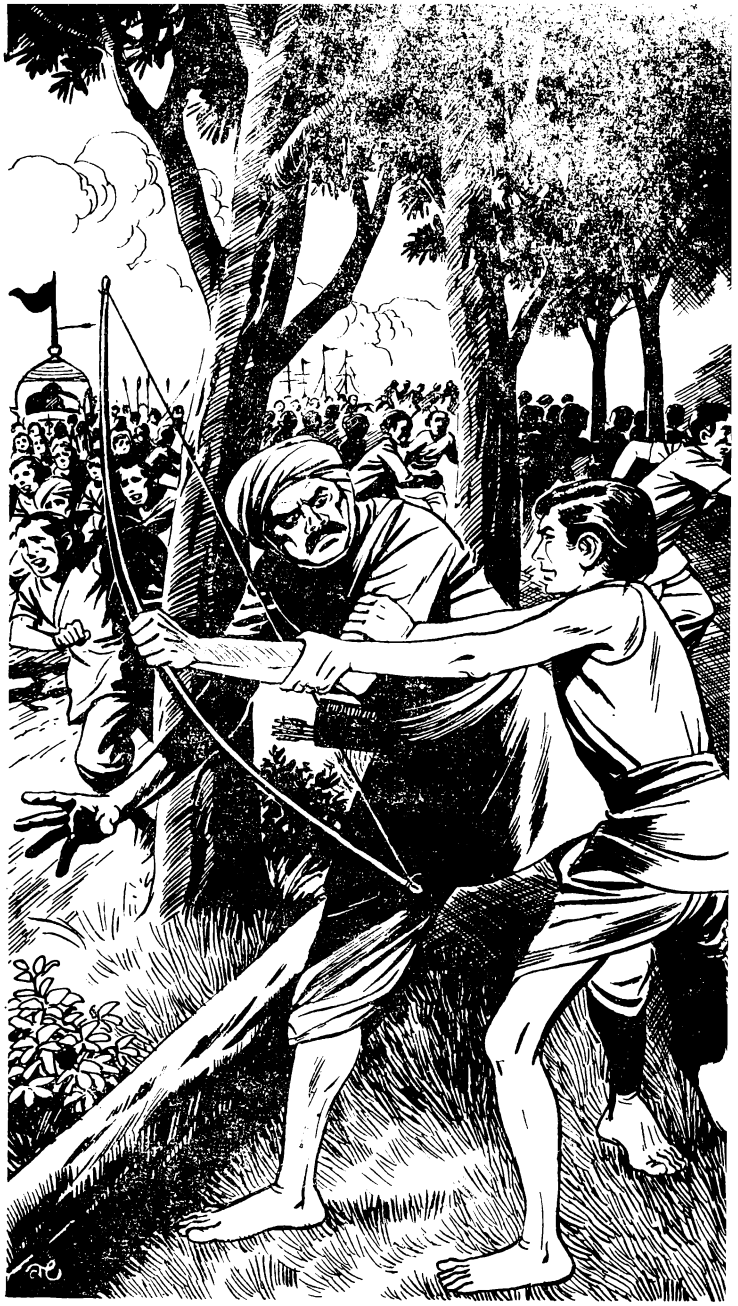

গা-বেয়ে-ওঠা সেই লতানে শেকড় ধরে সন্তর্পণে নেমে সে প্রথমে জঙ্গলের ধারে গিয়ে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলেছিল। কিন্তু তখুনি তাতে না চ'ড়ে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বনের ভেতর দিয়েই ঘোড়াটাকে যথাসম্ভব নিঃশব্দে নিয়ে গিয়েছিল হাঁটিয়ে। বন থেকে বেরিয়ে এবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে ঘেসুড়েদের গাঁয়ের দিকেই রওনা হয়েছিল। সেখানে যখন পেঁছিছিল তখনও ভোর হতে কিছু দেরি আছে। গরিব চাষীদের গাঁ। গোলপাতা আর খড়ে ছাওয়া কয়েকটা মাটির কুঁড়ে মাত্র। গাঁয়ের বাইরের মাঠে নানা জায়গায় কাটা ঘাসের গাদা। দু-একটা ঘাসের বোঝা জংলা লতা দিয়ে একেবারে বেঁধে-ছেঁদে তৈরি করে রাখা। চাষীরা তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। ভোরে উঠে তারা ওই ঘাসের বোঝা নিয়ে ধুমঘাটে রওনা হবে নিশ্চয়। শেখর কিন্তু তাদের জাগবার অপেক্ষায় বসে থাকে নি। সুবিধেমতো একটা জায়গায় তার পোশাক-আশাক লুকিয়ে রেখে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে ছোটো ক'রে পরেছে। তারপর তাতে ধুলো কাদা লাগিয়ে ময়লা ক'রে বাঁধা-ছাঁদা একটা ঘাসের বোঝা বেছে নিয়ে নিজের পেছনে ঘোড়াটার পিঠেই চাপিয়ে ধুমঘাটের কাছাকাছি এসে থেমেছে। সেখানে ঘোড়াটাকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে সে পুরোপুরি ঘেসুড়ে সেজে পা চালিয়েছে ধুমঘাটের দিকে। মনের ভেতর তখন একটা শুধু তার আফসোস। যে-বেচারার কষ্ট করে কাটা ঘাসের বোঝা সে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পয়সা-কড়ি কিছু দিয়ে আসতে সে পারে নি। তার কাছে দেবার মতো কিছু ছিল না এমন নয়। তার উষ্ণীষের মধ্যে কয়েকটা আশরফি তখনো লুকোনো ছিল। কিন্তু সে-আশরফির একটা ঘাসের দাম হিসেবে রেখে এলে ঘেসুড়ের উপকারের বদলে সর্বনাশই হয়ত করা হবে বলে তার মনে হয়েছে। আশরফি কোথা থেকে পেল সে-কৈফিয়ত দিতেই ঘেসুড়ে চাষীর হয়ত প্রাণান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত তলোয়ার বাঁধবার চামড়ার কোমরবন্ধটা সে ঘাসের জায়গায় অনেক ভেবে চিন্তে রেখে এসেছে। কোমরবন্ধটা দামী কিছু নয়। সাদাসিধে ধরনের ধুমঘাটে কারুর চোখে পড়বার মতো পোশাক-আশাক নিয়ে তো সে আসে নি। কোমরবন্ধটাও সেই সাধারণ পোশাকের সঙ্গে মানানসই। এ-কোমরবন্ধটা কারুর কাছে বিক্রি করে ঘেসুড়ে কিছু দাম হয়ত পেতে পারে। একটা সাধারণ কোমরবন্ধের জন্যে এমন-কিছু জবাবদিহি তাকে দিতে হবে না নিশ্চয়।

ঘেসুড়ে সেজে তলোয়ার নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব নয় বলেই কোমরবন্ধটা খুলে ওইভাবে রেখে আসবার

কথা অবশ্য তার মনে হয়েছিল।

এই সামান্য একটা কোমরবন্ধ যে আবার অমনভাবে সে ফেরত পাবে তখন ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু সে পরের কথা।

ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথমে শেখর ধূমঘাটে ঢোকবার একটি রাস্তার ধারে এসে একটা ভাঙা কুঁড়ের আড়ালে অপেক্ষা করেছে। সদানন্দ আর রূপরামের এই রাস্তা দিয়েই আসবার কথা।

অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে বেশ কিছুক্ষণ। তাদের বাহারে গোরুর গাড়ি নিয়ে রূপরাম আর সদানন্দ বেশ একটু বেলাতেই এসে পৌঁছেছে। কোশা ভাসানোর তখনও অবশ্য দেরি আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই গাঙের ধারে লোকজন জড়ো হয়েছে প্রচুর।

গরুর গাড়িটা চালিয়ে এনেছে রূপরাম নিজে। সনাতন তীরন্দাজের সাজে ছিল ভেতরে। রাস্তার ধারে নির্জন গোছের জায়গা দেখে রূপরাম গাড়িটা একবার থামাবার পরেই সদানন্দ পেছনের জরি-মখমলের পর্দা সরিয়ে নেমে পড়ে গরুর গাড়ির আগে-আগে শহরের ভেতর ঢুকেছে।

আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করে শেখরও ঘাসের বোঝা নিয়ে তার পিছু নিয়েছে তখুনি। সেই থেকে সদানন্দকে নজরে-নজরে রেখেই সে কাছে-পিঠে ঘুরছে। ঘোরা-ফেরার মধ্যে বাহারে গরুর গাড়িটা রূপরাম কোথায় রেখে কোশা-ঠেলা মানুষদের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে তাও সে দেখে রাখতে ভোলে নি।

ফেরিওয়ালার কাছের ভিড় থেকে ঠেলা খেয়ে শেখর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাকে বলে এক চোখ সদানন্দের ওপরে রেখে আর এক চোখে আশপাশের ব্যাপারও লক্ষ্য করে।

যশোর-রাজ আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের আসতে বোধহয় বেশি দেরি নেই। বল্লম হাতে একদল সৈনিক গাঙ পর্যন্ত একটা রাস্তার ভিড় দুদিকে সরাচ্ছে। তাদের পেছন থেকে খোলা তলোয়ার হাতে নৌ-সেনার দল আসছে ঘাটের দিকে।

চারদিকের লোকজনের এলোমেলো গোলমাল হঠাৎ যেন জড়ো হয়ে আকাশ কাঁপানো জয়ধ্বনি হয়ে উঠে ঃ

জয় যশোরেশ্বরীর জয়! জয় মহারাজের জয়!

হ্যাঁ, ওই তো যশোরের নিশান দূরের রাস্তায় ভিড়ের মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে। মহারাজের খোলা রথের ওপরকার রাজছত্রও দেখা যায় তারপর।

মহারাজের রথের দুধারে ঘোড়ায় চড়ে যাঁরা আসছেন তাঁদের সোজা করে ধরা বল্লমের ডগাগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে সোনালি রোদে।

মাথার ঘাসের বোঝাটা নামালে শেখর আর-একটু ভালো ক'রে দেখতে পারে। কিন্তু সাহস হয় না বোঝা নামাতে। যদি কেউ চিনে ফেলে।

কাছে থেকে সদানন্দের ওপর লুকিয়ে নজর রাখবার জন্যেও বোঝাটা মাথায় রাখা দরকার।

যশোরেশ্বরী আর যশোর-রাজের জয়ধ্বনি শুনেই সদানন্দ ব্যগ্র হয়ে উঠে ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

শেখরও যতখানি সম্ভব তার কাছাকাছি থাকে।

কী করবে এবার সদানন্দ?

মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ঘাটের দিকে যাবার পথেই কি সে তীর ছুঁড়ে মারবে, না অপেক্ষা করবে তাঁর ঘাটে পৌঁছে কোশা ভাসাতে নামা পর্যন্ত?

শেখর নিজে কী করবে তা সে ঠিক করেছে কি?

কোন্ সঙ্কল্প নিয়ে সে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে ছায়ার মতো সদানন্দের কাছাকাছি ফিরছে?

রূপরাম ও সদানন্দের ভয়ঙ্কর চক্রান্ত কিভাবে কতখানি সফল হয় তাই দেখবার জন্যে কি?

ঘাটে যাবার পথেই যশোর-রাজের ওপর তীর ছোঁড়া বোধহয় সদানন্দের উদ্দেশ্য নয়।

কোশা ভাসাবার ঘাটের দিকেই ভিড়ের মধ্যে মিশে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেখর হাজির আছে তার পেছনে-পেছনে।

এবার গাঙের পাড়ের কাছাকাছি এসে গেছে। মানুষের ভিড়ে নদীর কাছের পাড় ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু কিছু দূরে ভরা গাঙের জলে নানা জাতের নানা সাজের নৌবহরের যেন গাদি লেগে গেছে মনে হয়। সুলুপ, ঘুরাব, মাচোয়া, গছাড়ি, পাশত, কোন জাতের নৌকোরই সেখানে অভাব নেই। থেকে-থেকে অনেক নৌকো থেকে ফিরিঙ্গি নাবিকরা গাদা-বন্দুক ছুঁড়ে তাদের উল্লাস জানাচ্ছে।

কাছের পাড়টাও এবার কিছু-কিছু দেখা যায়।

এক-আধটা নয়, সার-সার অনেক কোশা সেখানে পাড়ের কাছে সাজানো।

সদানন্দ জমাট ভিড় থেকে একটু সরে এসে এবার একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন ভালো ক'রে দেখার জন্যে। ভিড়টা সেখানে একটু

হালকা।

শেখর তার পেছন দিয়ে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে একটু এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে কড়া গলায় হুকুম শোনে —এই হতভাগা, কোথা যাচ্ছিস? নামা তোর ঘাসের বোঝা!

চকিতে একবার পেছন ফিরেই শেখর শিউরে ওঠে।

কোতোয়ালির একজন পাহারাদারই কিছু দূর থেকে হাঁক দিয়ে তার দিকে আসছে।

ব্যাপারটা হয়ত ভয়ের কিছু নয়। এই এতজনের ভিড়ের মাঝখানে সামান্য একজন ঘেসুড়ে ছেলেকে পাহারাদার কোনরকম সন্দেহ করবেই বা কেন? হয়ত কোন সওয়ারের জন্যে ঘাস কেনবার উদ্দেশ্যেই পাহারাদার তাকে দাঁড়াতে হুকুম করেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এ সব কথা ভেবে নিলেও অনুমান ঠিক কি বেঠিক যাচাই করবার জন্যে অপেক্ষা করতে শেখরের সাহস হয় না।

এক ঝটকায় বোঝাটা ছুঁড়ে ফেলে সে উল্টো দিকে দৌড় দেয়। ভিড়ের মধ্যে এঁকে-বেঁকে ছুটে দম প্রায় ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত ফিরে তাকায় না সে।

না, সে পাহারাদার আর ধারে-কাছে কোথাও নেই। শেখরের পেছনে সে ধাওয়া করবার চেষ্টা করেছিল কি না তাও সঠিক বলা যায় না।

বিপদ কিছু থাক বা না থাক শেখর এখন নিশ্চিন্ত হতে পারে একটু।

কিন্তু সত্যি তাও পারছে কি?

সদানন্দ যেখানে গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সেখান থেকে অনেক দূরে সে চলে এসেছে।

যশোররাজ আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এতক্ষণে কোশা ভাসাবার ঘাটের কাছেই প্রায় পৌঁছে গেছেন নিশ্চয়। আর খানিক বাদেই রাজপুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে অনুষ্ঠান শুরু করবেন।

সদানন্দ ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি?

সে উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য তার কখনো ফসকায় না।

শেখর আবার সেই গাছের গুঁড়িটার দিকেই ছুটতে শুরু করে। কিন্তু সদানন্দ তার অব্যর্থ তীর ছোঁড়বার আগেই সেখানে সে পৌঁছতে পারবে কি?

১০

সূর্যকান্ত একা-একাই ভিড়ের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে কোশা ভাসানোর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন।

যশোররাজের মিছিলের সঙ্গীদলে ইচ্ছা ক'রেই তিনি যোগ দেননি। সত্যি কথা বলতে গেলে কোশা-ভাসানো নিয়ে এই ঘটা করায় তাঁর আপত্তিই ছিল। তাঁর আপত্তির কথা তিনি যশোর-রাজের প্রধান সভাসদদের জানিয়েও দিয়েছিলেন।

নতুন কোশার রহস্য গোপনই রাখা উচিত, এই তাঁর মত। গোপন অস্ত্র হিসেবে মান সিংহের বিরুদ্ধে যা ব্যবহার করা হবে, আগে থাকতে তার পরিচয় ঘটা ক'রে জানানো যুদ্ধের চাল হিসেবে ভুল, এই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন যে শত্রুর চর কেউ-না-কেউ ধুমঘাটে আছেই। কোশার আসল প্যাঁচ না-জানতে পারুক, তা কী ধরনের অস্ত্র, এ-খবরটা মানসিংহকে তো চরেরা দিতে পারবে। সে-সুযোগ যশোর দেবে কেন?

সভাসদদের মধ্যে এক সুখাসর্দার ছাড়া আর কেউ কিন্তু তাঁকে সমর্থন করেনি।

ফিরিঙ্গি নৌ-সেনাপতিরা তো সূর্যকান্তর কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।

রডা বলেছে, মানসিংহ এ-কোশার খবর পেলে আমরা তো খুশিই হবো। কোন্ হাটে ছুঁচ বেচতে এসেছে তাহ'লে বুঝবে।

পেড্রো আর ডুডলি বলেছে,—এ কোশার খবর পেলেও তার প্যাঁচ বুঝতে ওদের জাত-জন্ম কেটে যাবে। ওদের জারিজুরি যদি কিছু থাকে তো ডাঙায়। এই জলের ভেলকির কথা শুনেই একেবারে কুপোকাৎ হবে।

তবু দেখা সাপের ছোবল ভোঁতা। যুদ্ধের একটা বড়ো প্যাঁচ হ'লো শত্রুকে হকচকিয়ে দেওয়া।—সুখাসর্দার সূর্যকান্তের পক্ষ নিয়ে বলেছে,—আচমকা এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারলে ওদের যে-রকম দিশে-হারা করা যেত, আগে থেকে জানতে দিলে তা কি আর হবে?

আগে থাকতে জানবেই বা কেন?—তর্ক করেছে ডুডলি,—সুখাসর্দারের তো জানি বাজপাখির চোখ। সে-চোখে কি ছানি পড়েছে যে মান সিংহের নেংটি-চরেরা ধুমঘাটের খবর নিয়ে তার নজর এড়িয়ে পালাবে!

কথার মধ্যে যে বিদ্রূপটুকু ছিল তাতে সুখাসর্দার জ্বলে উঠেছে। বলেছে,—সুখাসর্দারের চোখের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, ডুডলি। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। ধুমঘাট থেকে একটা বেইমান পিঁপড়েও সুখাসর্দারের পাহারার ফুটো দিয়ে গলতে পারবে না এইটুকু শুধু বিশ্বাস করতে পারো।

তবে আর ভাবনাটা কী?—পেড্রো আর রডা হো-হো করে হেসে উঠে সুখাসর্দারের পিঠে চাপড় দিয়ে ডুডলিকে বলেছে,—বড়ো বেফাঁস কথা বলে ফেলেছো হে। সুখাসর্দারের যে আঙুলে কড়া সেইটেই মাড়িয়ে ফেলেছো। সুখাসর্দারের বাপান্ত করলেও সে সইবে, কিন্তু তার দপ্তর নিয়ে একটু খোঁচা দিয়েছ কি সে ফোঁস কেউটে।

আমি মাপ চাচ্ছি।—হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ডুডলি।

হাসাহাসির মধ্যেই আলোচনাটা থেমে গেছে। কোশা-ভাসানোর উৎসব বন্ধ করার প্রস্তাবটা চাপা পড়ে গেছে ওইখানেই।

সূর্যকান্ত আর কিছু বলেন নি, তবে সেজে-গুজে সমারোহতে যোগ দিতে না-চাইলেও উৎসবটা লক্ষ্য করবার জন্যে একা-একাই মেলার মধ্যে নিজের খেয়াল মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হবার আর দেরি নেই। যশোর রাজের দলবল প্রায় ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ একটা তুমুল হট্টোগোলের শব্দে সূর্যকান্ত চমকে ওঠেন। যশোর-রাজের রথের কাছে কী যেন একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। চারদিক থেকে সেখানকার জটলার দিকে লোকজন চীৎকার করতে করতে ছুটছে।

হতভম্ব হয়ে সেদিকে যেতে-যেতেই সূর্যকান্তকে শিউরে উঠে থেমে যেতে হয়। সমস্ত গোলমালের ভয়ংকর কারণটা যশোর-রাজের রথের চূড়ার গায়েই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রথের শীর্ষদণ্ডে গভীরভাবে বেঁধা একটা তীর তখনো কাঁপছে।

যশোর-রাজকে হত্যা করবার জন্যেই ও-তীর ছোঁড়া হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু যশোরের বুকের ওপর, এই ধুমঘাটের মেলায় স্বয়ং মহারাজকে হত্যার চেষ্টা করবে, এতো বড়ো দুঃসাহস হতে পারে কার?

ঠিক এই মুহূর্তেই কিছু দূরের অদ্ভুত ঘটনাটা সূর্যকান্তের চোখে পড়ে।

চারদিকে ভীত উত্তেজিত লোকজনের ছোটাছুটি। তারই মধ্যে একজন তীরন্দাজ সৈনিকের সঙ্গে চাষাভুষো গোছের একটা মানুষের প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি চলছে। ভালো করে একটু নজর দিয়ে অত্যন্ত অবাক হতে হয়। তীরন্দাজ সৈনিকের সঙ্গে যার হাতাহাতি চলেছে সে নেহাৎ অল্পবয়সী একটা ছেলে। কাছে-পড়ে-থাকা ঘাসের বোঝা দেখে ঘেসুড়ে ছেলে বলেই মনে হয়। তীরন্দাজের ধনুকটা নিয়েই কিন্তু দু'জনের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলেছে।

একটা ঘেসুড়ে ছেলের এ-রকম আস্পর্ধার কথা সূর্যকান্ত ভাবতেই পারেন না। ব্যাপারটার মধ্যে যে-রহস্যই থাক তা যে গুরুতর এবং এইমাত্র যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটেছে তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের যোগ কিছু থাকা সম্ভব অনুমান করে সূর্যকান্ত সে-দিকে ছুটে যান।

তিনি পৌঁছোবার আগেই দেখা যায় তীরন্দাজ সৈনিকের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘেসুড়ে ছেলেটা মুখ থুবড়ে মাটির ওপর পড়ে গেছে। তীরন্দাজের ধনুকটা কিন্তু তখন সেই ঘেসুড়ে ছেলেটারই হাতে।

সূর্যকান্ত সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পরেই ছেলেটা মাটি থেকে উঠে বসে। কপালের খানিকটা থেঁৎলে কেটে গিয়ে তার মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একবার ছেলেটার একবার তীরন্দাজ সৈনিকের দিকে চেয়ে সূর্যকান্ত কড়া গলায় তীরন্দাজকেই আগে ধমকে দেন।

কী, হচ্ছে কী তোমাদের! তীরন্দাজ হয়ে একটা ঘেসুড়ে ছেলের সঙ্গে মারামারি করছো তুমি! কেন?

তীরন্দাজ সূর্যকান্তকে সম্ভবতঃ চিনতে পেরেই প্রথমটা থতমত খেলেও তারপর উত্তেজিতভাবে বলতে শুরু করে,—কেন মারামারি করছি জিজ্ঞেস করছেন? জানেন ও কী করেছে? যাকে ঘেসুড়ে ছেলে ভাবছেন সে ঘেসুড়ে নয়, মোগলদের শয়তান চর!

সূর্যকান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন,—মোগল-দের চর?

হ্যাঁ, চর, চোরা কালসাপ!—তীরন্দাজ উত্তেজিতভাবে বলতে থাকে,—আগে ওকে ধরুন। পালাতে দেবেন না। এইমাত্র মহারাজকে মারতে ও তীর ছুড়েছে।

তীর ছুড়েছে এই ঘেসুড়ে ছোকরা!—সূর্যকান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে ধমক দিয়ে ওঠেন,—এ ধনুক তো তোমার! ও তীর ছুড়বে কী ক'রে!

আজ্ঞে দোষ এক হিসেবে আমার-ই।—অনুতপ্ত অপরাধীর মতো অত্যন্ত কাতরভাবে বলে যায় তীরন্দাজ, —মহারাজের শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আমি একটু অসাবধান হয়ে গেছলাম। কখন যে এই ঘেসুড়ে-সাজা ছেলেটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কখন আমার পিঠের তূণ থেকে কটা তীর খুলে নিয়েছে টেরও পাইনি। তারপর হঠাৎ এক সময়ে আমার কাঁধ থেকে ধনুকটা টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। টের পেয়েই ছুটে আমি ওর পিছু নিয়ে ওকে ধরে ফেলি। কিন্তু তার আগেই ও একটা তীর ছুড়ে দিয়েছে। তীর ছোড়ার মুখেই গিয়ে বাধা না দিলে মহারাজ রক্ষা পেতেন না।

কী বলছো তুমি!—সূর্যকান্ত বিমূঢ়ভাবে বলেন—মহারাজকে মারবার এতখানি ফন্দি করেছে ওই ঘেসুড়ে!

আজ্ঞে বিশ্বাস করুন আমার কথা। ও ঘেসুড়ে নয়।—তীরন্দাজ আবার উত্তেজিতভাবে বলে,—ওকে ধরে ভালো করে একবার চেয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝবেন ও সত্যি ঘেসুড়ে না মিথ্যে সেজে এসেছে। ঘেসুড়ে ছেলে হলে অমন ধনুক ছুড়তে পারে, না আমার মতো তীরন্দাজের সঙ্গে লড়তে সাহস পায়!

ছেলেটা এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তীরন্দাজের কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কঠিন হ'লেও সূর্যকান্ত দু-পা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার একটা হাত ধরে ফেলেন। তারপর খানিক তার দিকে চেয়ে থেকে তীব্রস্বরে বলে ওঠেন,—শেখর! তুমি!

সে-স্বরে যতখানি বিস্ময় তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা ও রাগের জ্বালা।

সেই দুঃসহ রাগেই শেখরের দুটো কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে সূর্যকান্ত আবার জ্বলন্ত স্বরে বলেন,—একটা কালসাপকে আমি এতখানি ভালবেসে বিশ্বাস করেছিলাম! আর সে-বিশ্বাস দু-পায়ে থেঁৎলে তুমি এখানে ঘেসুড়ে সেজে এসেছো মহারাজকে মারতে।

শেষের দিকে সূর্যকান্তের গলায় রাগ ও ঘৃণার সঙ্গে একটা হতাশ বেদনার সুরও যেন মিশে যায়

শেখরের রক্তমাখা মুখের ঠোঁট দুটো একটু বুঝি কেঁপে ওঠে। তার রুদ্ধকণ্ঠে বলবার কথাগুলো যেন আটকে যাচ্ছে। অতিকষ্টে সে অস্ফুট ধরা গলায় কোনোরকমে বলে,—আপনি ওর কথাই বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ, করি।—গর্জন করে ওঠেন সূর্যকান্ত,—যশোরের তীরন্দাজবাহিনীর কেউ এত বড়ো মিথ্যেকথা বলতে পারে না।

আমার কথা তাহলে শুনবেন না?—এবার শেখরের স্বর স্পষ্ট ও একটু কঠিন।

না, শোনবার কিছু নেই!—সূর্যকান্ত ঘৃণাতিক্ত কণ্ঠে বলেন,—অতো বড়ো বিশ্বাসের অপমান করে তুমি যে ঘেসুড়ে সেজে লুকিয়ে ধুমঘাটে এসেছো, তোমার বিরুদ্ধে এই প্রমাণই যথেষ্ট। চলো, তোমার যোগ্য ব্যবস্থাই এবার করবো।

শেখর তীব্র দৃষ্টিতে সূর্যকান্তর দিকে একবার চেয়ে কী বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে, সূর্যকান্ত তাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে এগিয়ে যেতে গিয়ে একটু থামেন। পিছন ফিরে তীরন্দাজকে বলেন,—তুমিও সঙ্গে এসো, কী নাম তোমার?

আজ্ঞে সদানন্দ!—নিরর্থক বলেই সদানন্দ বোধহয় নিজের নামটা গোপন করে না। যেভাবে প্রথম বিপদ সে কাটিয়েছে তেমনি কোনো উপস্থিত বুদ্ধির কৌশলে সূর্যকান্তর খর্পর থেকে অবিলম্বে পালাতে না পারলে আসল বা ছদ্মনাম দুই-ই যে সমান হবে তা সে ভালো করেই জানে।

সেই সুযোগই যে অমন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মুহূর্তেই মিলবে তা সে আশা করতে পারেনি।

এতক্ষণ সূর্যকান্তকে মিথ্যে অভিনয়ে ভোলাবার চেষ্টার মধ্যেও মনে মনে সে রূপরামের ওপর গরজেছে। রূপরাম তাকে মিথ্যে স্তোক দিয়েছে, এই তার সন্দেহ।

কিন্তু দেরী একটু করলেও রূপরাম যে কথার খেলাপ করেনি, সেই মুহূর্তে তার ভয়ংকর প্রমাণ হঠাৎ কোশা ভাসানের ঘাটে জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে।

ধুমঘাটের গাঙের পাড়ের সমস্ত লোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জগদ্দল কামানের গর্জনের মতো শব্দে হঠাৎ সেই-দিন দুপুরের আলোতেই আতসবাজির একটা পাহাড় যেন গাঙের জলের ওপর ফেটে গিয়ে জ্বলে ওঠে বলে মনে হয়। তারপর যেমন গাঙের জলের ওপর জাহাজে নৌকোয়, তেমনি পাড়ের জনতার মাঝখানে শুরু হয় ভীত উত্তেজিত চীৎকার আর ঠেলাঠেলি।

সূর্যকান্তও সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ও গাঙের জলের ওপর লাফিয়ে-ওঠা আগুনের হল্কায় বিহ্বলভাবে চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজের অজান্তেই শেখরের হাতটা যে তখন তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সে-খেয়াল তাঁর ছিল না।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে ব্যাপারটা একটু অনুমান করার পর সে-খেয়াল তাঁর হয়। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পাশে তাকিয়ে বুঝতে পারেন ভাবনার তাঁর কোনো কারণ নেই। হয়তো আর সকলের মতো বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েই সুযোগ পেয়েও শেখর পালাবার চেষ্টা করতে পারেনি। নীরবে কঠিন মুখে তাঁর পাশেই সে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটা অভূতপূর্ব ঘটনায় তেমন কোনো বিস্ময়ের ছাপ তার মুখে যে দেখা যায় না, এইটুকুই যা আশ্চর্য।

শেখরের হাতটা আবার শক্ত করে ধরে ফেলে সূর্যকান্ত এবার পিছন দিকে তাকান।

চারদিকে উত্তেজিত সন্ত্রস্ত মানুষের ছোটাছুটি। তার মধ্যে সদানন্দকে কোথাও দেখা যায় না।

[চলবে]

● ময়ূখ চৌধুরী ●

প্রথম পরিচ্ছেদ ● রহস্যময় অন্তর্ধান!

পূর্ব-আফ্রিকার পর্তুগিজ-অধিকৃত উপনিবেশ মোজাম্বিক-এর রাজধানী বায়রার ২,০০০ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী একদিন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সিডনি ব্যাঙ্কে বিল নামে যে হিসাব-রক্ষকটি কাজ করে সে হঠাৎ সেইদিন সকালে তার গৃহে অনুপস্থিত কেন? মাত্র তিনদিন আগে ঐ শহরে যে মানুষটি পদার্পণ করেছেন, সেই আন্তিলিও গত্তি নামক নবাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে বিলের আসন্নপ্রসবা তরুণী বধূ ম্যারিয়ার শহর ত্যাগ করে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অত্যন্ত রহস্যময়। আন্তিলিওর নিজস্ব গাড়ীতে তাঁরই নিগ্রো ড্রাইভারের সঙ্গে ম্যারিয়ার যাত্রা শুরু; সেই সময় যারা মেয়েটিকে দেখেছে তারা চমকে উঠেছে—মেয়েটির মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ, রক্তশূন্য!.....

কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তির অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী যাঁরা প্রথম থেকে পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে বিল নামধারী যুবকটি অপরিচিত নয়। কিন্তু 'কায়না' ও 'শয়তানের ফাঁদ' যাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় নি, সেইসব পাঠকের পক্ষেও বর্তমান কাহিনীর রসগ্রহণ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না, যখন তাঁরা জানতে পারবেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তিলিও গত্তি নামক মিত্রপক্ষের জনৈক সৈনিকের নেতৃত্বে আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মানুষ, জীবজন্তু ও অরণ্য-সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা করতে উক্ত মহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন দুটি শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রী—'প্রফেসর', এক ফরাসী চিকিৎসক এবং 'বিল', এক দুঃসাহসী মার্কিন যুবক।

প্রফেসর এই কাহিনীতে অনুপস্থিত, শুধু প্রসঙ্গ উঠল বলেই তাঁর নামের উল্লেখ। বিলকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিষয়ের অবতারণা।

প্রথম পরিচয়ের সময়ে আন্তিলিও সাহেব ঐ যুবকের আফ্রিকা ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। পরবর্তীকালে আন্তিলিও জানতে পেরেছিলেন অগণিত হস্তিযূথের সংখ্যাকে রাইফেলের সাহায্যে যথাসম্ভব কমিয়ে দেবার জন্যই আফ্রিকার অরণ্যে বিলের আবির্ভাব। হাতী শিকারের জন্য তার অস্বাভাবিক আগ্রহের আসল কারণটা যখন গোপন রইল না, তখন মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন আন্তিলিও—কিন্তু সেইসময় বিলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ছিল না, নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশে রক্তাক্ত এক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে অমোঘ ভাগ্য-চক্র।

অনেক শিকারীর কাছে হাতী-শিকার নিতান্তই একটা শখ, কিন্তু বিলের ব্যাপারটা তা নয়। সমগ্র হস্তিজাতি সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষপোষণ করতো বিল। তার বাল্যকালে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী একটি হাতী এবং সেই ঘটনা বিলের মনোরাজ্যে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে—শৈশব থেকে কৈশোর আর

কৈশোর থেকে যৌবনের পরিণতি এক শোকার্ত শিশুর চিন্তার জগতে ধীরে ধীরে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়, দুঃখ-বেদনার পরিবর্তে জেগে ওঠে প্রতিহিংসার রক্ত-লোলুপ সংকল্প।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমেরিকার 'ডেট্রয়েট' নামক স্থানে। বিল যখন পাঁচ বছরের শিশু সেইসময় তার বাপ-মা তাকে পূর্বোক্ত স্থানে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সার্কাসের হাতীদের মধ্যে একটি হস্তিনী ছিল শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। লক্ষ্য লক্ষ্য শিশু তাকে দেখার জন্য ভিড় করতো। হস্তিনীর স্বভাব-চরিত্র খুবই শান্ত, বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য খোকা-খুকুর হাত থেকে বাদাম প্রভৃতি লোভনীয় খাদ্যের উপহার গ্রহণ করেছে ঐ জন্তুটি, কোনদিনই তার আচরণে উগ্রতার আভাস দেখা যায় নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে ক্ষেপে গেল,—তীব্র বৃংহন-শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে সে ছিঁড়ে ফেলল পায়ের শিকল, তারপরই শুরু হল ভয়ংকর কাণ্ড। সার্কাসের দড়ি আর বেড়া ভেঙ্গে-চুরে উড়িয়ে ছুটে চলল ক্রোধোন্মত্ত হস্তিনী, চলার পথে মানুষজন যাকে পেল তাকেই শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে সজোরে ছুঁড়ে ফেলল এদিক-ওদিক, এবং অনেকগুলো মানুষকে হতাহত করার পর সে এসে দাঁড়াল একটা মালবহনকারী শকটের সামনে। অন্ধ ক্রোধে আত্মহারা হস্তিনী তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ীর উপর। তার খর্বাকৃতি গজদন্ত দুটি শকট ভেদ করে গুরুভার বস্তুটিকে অতি সহজেই শূন্যে তুলে ফেলল—পরক্ষণেই শকটসমেত হস্তিনীর প্রকাণ্ড মৃতদেহ ভীষণ শব্দে গড়িয়ে পড়ল মাটির উপর! বোধ-হয় হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে জন্তুটার মৃত্যু ঘটে-ছিল। হৈ হৈ! চিৎকার! ধুন্ধুমার!

(হস্তিনীর গজদন্তের কথা শুনে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—এশিয়ার হাতীদের মধ্যে নারীজাতি উক্ত মহাস্ত্রে বঞ্চিতা হলেও প্রকৃতির কৃপায় আফ্রিকার 'মহিলারা' পুরুষদের মতোই দন্তসজ্জায় সুসজ্জিতা, ভয়ংকরী। বলাই বাহুল্য যে, সার্কাসের হস্তিনী ছিল আফ্রিকার জীব।)

যাই হোক, ঐ গোলমালের মধ্যে বাচ্চা বিলকে তার বাপ-মা'র কাছ থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে এনেছিল সার্কাসের জনৈক কর্মচারী। একটু পরেই বিল দেখতে পেল মায়ের মৃতদেহ পড়ে আছে মাটির উপর, পাশেই হাঁটু পেতে বসে আছেন বাবা। এক বছর পরেই বিলের বাবা মারা গেলেন। স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যুর শোক তাঁর আয়ুক্ষয় করে দিয়েছিল।

ঐ দুর্ঘটনার তেইশ বছর পরে নিউইয়র্ক শহরে বিল আর আত্তিলিওর সাক্ষাৎকার। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান বিষয়ক অভিযান-কার্যে সাহায্য করার জন্য সঙ্গী হিসাবে বিলকে নির্বাচিত করেছিলেন আত্তিলিও। তাঁর সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিলের মুখ। প্রথমেই আত্তিলিওর কাছে বিল যে প্রশ্নটি করেছিল তার মর্ম হচ্ছে আফ্রিকাতে হাতী-শিকারের সুযোগ আছে কি না।

"শুধু হাতী কেন," আত্তিলিও উত্তর দিয়েছিলেন, "সিংহ, লেপার্ড, বন্য মহিষ, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি সব জানোয়ারই ওখানে বাস করে। চেষ্টা করলে গণ্ডার শিকারের সুযোগও হয়ে যেতে পারে।"

"কিন্তু", বিল জোর দিয়ে বলেছিলেন, "আমি হাতী মারতে চাই। জঙ্গলের পথে ঘোরাঘুরি করার কায়দা-কানুন শিখে গেলে আমি কি দু'একটা হাতী শিকার করতে পারব না?"

আত্তিলিও জানালেন হাতী মারতে গেলে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। বিনা অনুমতিতে আফ্রিকায় কোথাও হাতী মারতে দেওয়া হয় না, হাতী শিকারের জন্য অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা দরকার। বিভিন্ন উপনিবেশের আইন অনুযায়ী অনুমতিপত্রের জন্য যে মূল্য ধার্য করা হয়, সেটা হচ্ছে বিশ থেকে পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে। বে-আইনীভাবে হাতীশিকার করলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন কর্তৃপক্ষ।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে বিল জানিয়ে দিল আইন ভঙ্গ করে হাতীশিকারে তার আগ্রহ নেই। "টাকাটা কোন প্রশ্ন নয়, হাতীশিকারের অনুমতি পাওয়ার জন্য অথর্ব্যয় করতে আমি কুণ্ঠিত নই। বিলের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার আভাস, "কিন্তু হাতী মারতে হলে কি খুব বেশী অভিজ্ঞতার দরকার? আর আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি সেখানে কি হাতী আছে?"

আফ্রিকার যে অঞ্চলে অভিযাত্রীরা প্রথমে পদার্পণ করেছিলেন, সেই জায়গাটা হচ্ছে গজরাজ্যের প্রিয় বাস-স্থান—রোডেশিয়া। শিকারের অভিজ্ঞতার জন্য বিলকে তালিম দেবার দরকার হয় নি, কারণ মাছকে কখনও সাঁতার কাটার তালিম নিতে হয় না—দক্ষ শিকারীর অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি নিয়ে জন্মেছিল বিল, শিকার তার রক্তে রক্তে। দূরদর্শিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিকারীসুলভ সব গুণই তার ছিল, সেই সঙ্গে ছিল

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি এবং অতি-বলিষ্ঠ একজোড়া পা—দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বনচারী নিগ্রোরাও যখন শ্রান্ত ক্লান্ত, তখনও দৃঢ় পদক্ষেপে পথ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে বিলের আপত্তি নেই। উৎসাহ আর উদ্দীপনায় টগবগ করলেও বিপদের সময়ে বিল সম্পূর্ণ শান্ত, সংযত, নির্বিকার।

কয়েক মাসের মধ্যেই আফ্রিকাবাসী বিভিন্ন হিংস্র পশুর সম্মুখীন হল বিল। জন্তুগুলোকে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে তার একটুও অসুবিধা হয় নি। অনভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা অসম্ভব, সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মরণ-ফাঁদ থেকে অনায়াসে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে এসেছে বিল,—একবার নয়, বহুবার।

ঐসব দুঃসাহসিক 'অ্যাডভেঞ্চারে' লিপ্ত হয়ে বিল তার কর্তব্যে কখনও গাফিলতি করে নি। ভোর হওয়ার আগেই সে বেরিয়ে যেতো, ফিরে আসতো প্রাতরাশের সময়ে। কখনও কখনও অভিযাত্রীদের কর্মবিরতির পরে সে জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়তো নূতন অভিজ্ঞতার সন্ধানে। কঠিন পরিশ্রমের পর আন্তিলিওর দলবল যখন বিশ্রাম নিতে ব্যগ্র, বিলের উৎসাহ-বহ্নি তখনও প্রদীপ্ত! —বিশ্রাম শয্যা ছেড়ে সে এগিয়ে চলেছে শিকারের খোঁজে, সঙ্গে রয়েছে আন্তিলিওর নিগ্রো পথ প্রদর্শক ও বন্দুকবাহক মাতোনি!

শিকারের সন্ধানকার্যে মাতোনির দক্ষতা ছিল অসাধারণ, পথপ্রদর্শক হিসাবেও তার তুলনা হয় না। কিন্তু প্রথম বছরের শেষ দিকে সে আন্তিলিওকে চুপি চুপি জানিয়ে দিল হাতীদের সঙ্গে 'লম্বা মাসাংগার' (মাতোনির ভাষায় বিলের নামকরণ!) দেখা হওয়াটা প্রেতাত্মাদের অভিপ্রেত নয়—অতএব যতই চেষ্টা করা যাক লম্বা মাসাংগা কখনও হাতীর দেখা পাবে না!

ব্যাপারটা সত্যি বড়ই অদ্ভুত। মাতোনির সঙ্গে যথাস্থানে গিয়ে হস্তিযূথের সাক্ষাৎ পেয়েই তাড়াতাড়ি হাতীশিকারের 'পারমিট' বা অনুমতিপত্রের জন্য সচেষ্ট হয়েছে বিল এবং অনুমতিপত্র নিয়ে পূর্বোক্তস্থানে উপস্থিত হয়ে দর্শন করেছে আফ্রিকার নিসর্গশোভা—হাতীরা সেখানে অনুপস্থিত! কয়েকদিন আগেও যেখানে দলে দলে হাতী বিচরণ করেছে, সেখানে আজ একটি হাতীরও পাত্তা নেই! সব ভোঁ ভাঁ!

কিছুদিন পরেই অভিযানের কাজে অভিযাত্রীরা গেছেন আর এক অঞ্চলে। আগেকার অনুমতিপত্র এখানে অচল, কারণ—এখানে রাজত্ব করছে আর এক সরকার। সেখানেও হাতীদের দেখা পেল বিল, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাচরিত্র আর অর্থব্যয় করে আরও একটি 'পারমিট' জোগাড় করল সে, কিন্তু তারপরই আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! বিলও হাতীশিকারের অনুমতি পেয়েছে আর হাতীর দলও হাওয়া হয়ে গেছে সেই তল্লাট ছেড়ে! আশ্চর্য কাণ্ড!

অভিযাত্রীরা যখন মাম্বোয়া জাতির আস্তানায় 'কায়না' বা মৃত্যুগহ্বরের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সেইসময়ে বিলের কাছে জমেছে সাত-সাতটি হাতীশিকারের অনুমতিপত্র—কিন্তু অযথা অর্থব্যয় ছাড়া কোনই লাভ হয় নি, একটিও হাতী মারতে পারে নি বিল।

কায়না অভিযানে সাফল্যলাভ করে মাম্বোয়াদের নিয়েই বিল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মাম্বোয়াদের দেশে প্রায় সবরকম শিকারই সুলভ, কিন্তু হাতীরা ওখানে বাস করে না। তাছাড়া হাতীশিকারের পক্ষে যে মানুষটির সাহায্য অপরিহার্য, সেই মাতোনিকে আগেই মোজাম্বিক সীমান্তে দক্ষিণ রোডেশিয়াতে তার নিজস্ব গ্রামে পৌঁছে দিয়ে অভিযাত্রীরা এসেছিলেন উত্তর রোডেশিয়ার মাম্বোয়া রাজ্যে—অতএব হাতীর পিছনে তাড়া করার সুযোগ পেল না বিল। সকলে ভাবল বিল বোধহয় হাতীর কথা ভুলে গেছে।

কায়না অভিযানে সাফল্যলাভ করে মাম্বোয়াদের দেশ ছেড়ে অভিযাত্রীরা এলেন জুলুল্যান্ডে। আন্তিলিওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেখানকার পরিস্থিতি বেশ ভালো—প্রথমতঃ কয়েকশ' মাইলের মধ্যে হাতীর বসবাস নেই, দ্বিতীয়তঃ নরখাদক সিংহদের নিয়ে সকলে এমন ব্যতিব্যস্ত যে অন্য বিষয়ে মাথা ঘামানো অসম্ভব। ইনিয়াতি পর্বতমালার মধ্যে জুলুদের দেশে কয়েকমাস কাটিয়ে দিলেন সবাই। এর মধ্যে একবারও বিলের মুখে 'হাতী' শব্দটি শোনা গেল না। অবশেষে সর্দার জিপোসোর আদেশে অভিযাত্রীরা একদিন জুলুল্যান্ড ছাড়তে বাধ্য হলেন—প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে যে মুহূর্তে তাঁরা জুলুল্যান্ডের বাইরের পথটার উপর এসে পড়লেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই বিলের মুখে পরিচিত শব্দটি আবার শুনতে পেলেন সকলে—'হাতী'! বিল দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল অভিযাত্রীরা যা খুশী করতে পারেন, যেখানে খুশী যেতে পারেন—কিন্তু সে এখন হাতীর সন্ধানে যাত্রা করতে বদ্ধ পরিকর, অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে সে মোটেই রাজী নয়। বিল আরও জানাল বায়রা থেকে লণ্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার ভাড়ার টাকা রেখে বাকি সব টাকা প্রয়োজনবশে

খরচ করতে তার আপত্তি নেই—একেবারে কপর্দকশূন্য হওয়ার আগে সে হাতীশিকারের আশা ছাড়বে না।

বিলের আগ্রহ আর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আন্তিলিও আবার মাতোনির সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রফেসর আর বিলের সঙ্গে ঐ নিগ্রোশিকারীর বায়রা পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপরই হল বিচ্ছেদ। একদিকে গেলেন আন্তিলিও অন্যদিকে বিল আর প্রফেসর। ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আর বন্ধুদের খবর পান নি আন্তিলিও। দীর্ঘকাল পরে নূতন অভিযানের উদ্যোগে বায়রাতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আন্তিলিও হঠাৎ বিলের দেখা পেলেন।

বন্দরের মধ্যে যখন আন্তিলিওর নৌকা প্রবেশ করছে, সেইসময় একটি পর্তুগিজ 'লঞ্চ-এর' উপর দণ্ডায়মান বিলের দীর্ঘদেহ তাঁর নজরে পড়ল। আন্তিলিও অবাক হয়ে গেলেন—অন্ততঃ দশ মাস আগে যার আমেরিকাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেই মানুষটি এখন হাত দুলিয়ে দন্তবিকাশ করে তাঁকে তারস্বরে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে! তার পাশেই যে সুন্দরী তরুণীটি দাঁড়িয়ে ছিল, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখেই আন্তিলিও বুঝলেন সে বিলের স্ত্রী।

মিনিট দুই পরেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে মিলিত হলেন আন্তিলিও। শুরু হল করমর্দনের পালা, তুবড়ির মতো ছুটল বাক্যস্রোত। অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম নৌকা থেকে ডাঙ্গার উপর নামল; সেগুলোকে ভালভাবেই আন্তিলিও তদারক করলেন, ফাঁকে ফাঁকে তবু কথাবার্তার বিরাম নেই। বিল এবং তস্য পত্নী নিজস্ব গাড়ী চালিয়ে আন্তিলিওকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল, পথে গাড়ীর মধ্যেও চলেছে অবিরাম বাক্যের স্রোত। মধ্যাহ্নভোজের সময়েও আলাপের পালা অব্যাহত. সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল তখনও কথার শেষ নেই—অবশেষে আন্তিলিও যখন তাঁর লোকজনের কাজকর্ম পরিদর্শন করতে শুল্কবিভাগে ছুটলেন তখনই শেষ হল অবিশ্রান্ত বাক্যের ফুলঝুরি। বিলের কাছ থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই এর মধ্যে শুনেছেন আন্তিলিও। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে বর্ণিত হল।

জুলুল্যান্ড থেকে প্রফেসর আর মাতোনির সঙ্গে বায়রা শহরে আসার পথে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কোন হাতীকে পরলোকে পাঠানোর সুযোগ পায় নি বিল। তারা যখন বায়রাতে এসে পৌঁছাল, তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া খুব খারাপ। ইউরোপের বুকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা পর্তুগিজ উপনিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। প্রফেসরকে তাঁর মাতৃভূমি অর্থাৎ ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ফরাসী দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ। বিলের হাতে তখনও বেশ কিছু টাকা, সময়ও প্রচুর—অতএব নূতন উদ্যমে আবার হাতীর সন্ধানে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হল বিল। বিল নির্ঘাত হাতীর পিছনেই তাড়া করতো, কিন্তু লিসবন থেকে ম্যারিয়া নামে যে মেয়েটি বায়রাতে এসেছিল তাকে দেখে বিলের মন বদলে গেল। হাতীর কথা ভুলে ম্যারিয়ার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হল বিল।

কিছুদিনের মধ্যেই সে জানতে পারল ম্যারিয়ার দিক থেকেও তার প্রতি অনুরাগের অভাব নেই। অতঃপর ঘটনাচক্রের অনিবার্য পরিণতি, অর্থাৎ বিবাহ। বিয়ের পর সিডনি ব্যাঙ্কে একটা দস্তুরমতো ভালো চাকরি নিয়ে ম্যারিয়ার সাহচর্যে আদর্শ দম্পতির জীবন-যাপন করছিল বিল। আন্তিলিওর সঙ্গে যখন বিলের আবার দেখা হল তখন পরবর্তী সপ্তাহ থেকে একটা নয়দিন ব্যাপী ছুটি উপভোগের আনন্দে সে মশগুল।

শুল্কভবনের দিকে আন্তিলিওকে নিয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে বিল গল্প করছিল। এখানকার আবহাওয়া তার এবং নববধূর স্বাস্থ্যের উপযুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করল বিল; সামাজিক পরিবেশ চমৎকার, স্থানীয় ক্লাবগুলোতে নানাধরনের খেলাধূলার সুযোগও আছে—পরিশেষে তার বক্তব্য হল মানুষের জীবন যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে কত সুন্দর হতে পারে বিয়ের আগে সে ধারণা তার ছিল না।

বিলের কথা বার্তা এই পর্যন্ত বেশ উপভোগ করেছিলেন আন্তিলিও, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত!

"এখন আমার ছুটি," বিলের কণ্ঠস্বর আনন্দে উদ্বেল, "হাতীশিকারের নতুন 'পারমিট' পেয়েছি। ভিলা মাচাডো নামে যে জায়গাটা রয়েছে, সেখানে দানবের মতো অতিকায় একটা হাতী ভীষণ অত্যাচার করছে। এবারের ছুটিতে সেই হাতীটাকেই সাবাড় করব। খবরটা দিয়েছে মাতোনি। সেও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কি মজা!"

আবার হাতী! আন্তিলিওর মুখ শুকিয়ে গেল—সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্য আর মোটা মাইনের চাকরি বিলের মন থেকে প্রতিশোধের রক্তাক্ত সংকল্পকে মুছে ফেলতে পারে নি!

শুষ্কস্বরে তিনি বললেন, "মাতোনি? সে কোথা থেকে এল? তোমাদের পৌঁছে দিয়ে তার তো দেশে

ফিরে যাওয়ার কথা—এতদিন সে এখানে কি করছে?"

একগাল হেসে বিল জানাল সেইরকম কথাই ছিল বটে, কিন্তু মাতোনির জায়গাটা ভাল লেগে গেল বলে সে আর দেশে ফিরল না। বিল আরও বলল যে, ব্যাঙ্কের কাজে অন্ততঃ এক সপ্তাহের ছুটি না পেলে শিকারে যাওয়া অসম্ভব; সেই জন্যই সে এতদিন হাতী-দের নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তবে একসময়ে না এক-সময়ে সুযোগ যে পাওয়া যাবে সেবিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। সেই উদ্দেশ্যেই বরাবর নিগ্রোশিকারী মাতোনির সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। এখন নয়দিনের লম্বা ছুটি পাওয়া গেছে আর অতিকায় এক হস্তীর সংবাদও উপস্থিত, অতএব মাতোনিকে নিয়ে হস্তিনিধনের অভিযানে যাত্রা করার এমন সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় হারাতে সে রাজী নয়।

আন্তিলিওর সব সময়ই মনে হয়েছে বিল আর হাতীর যোগাযোগ এক অশুভ পরিণতির সূত্রপাত করবে। কোনদিনই তিনি বিলের হাতীশিকারের আগ্রহে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। এখনও সম্ভব হলে তিনি বাধা দিতেন, কিন্তু বিল এখন তাঁর অধীনে অভিযান-কার্যে ব্যাপৃত নয়—তাকে তিনি বাধা দেবেন কি উপায়ে? একমাত্র ভরসা—ম্যারিয়া।

আন্তিলিও বললেন, "তুমি বলতে চাও কালই তুমি বৌকে ফেলে রাইফেল ঘাড়ে হাতীর পিছনে ছুটবে? ...অসম্ভব। ম্যারিয়া কখনই রাজী হবে না।"

বিল সানন্দে দন্তবিকাশ করল, "আজ বিকেলে আমি ম্যারিয়াকে সব কথা খুলে বলব। বিয়ের আগে ম্যারিয়া আমাকে শিকার ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে-ছিল। আমি বলেছিলাম কয়েকটা হাতীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি শিকারে ইস্তফা দেব। ম্যারিয়া খুব ভাল মেয়ে। আমার প্রস্তাবে তার আপত্তি হয় নি। আমি যে এত দিন শিকারে যাই নি তার কারণ স্ত্রীর অসম্মতি নয়—ছুটি পাইনি বলেই আমি হাতী-শিকারের চেষ্টা করতে পারি নি। বুঝলে বন্ধু, এবার এমন বিরাট দুটি গজদন্ত আমি তোমার সামনে নিয়ে আসব যে, তেমন জিনিস তুমি জীবনে দেখ নি।"

আন্তিলিও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভবি ভোলবার নয়!.....

বিল যেদিন চলে গেল সেদিনটা ছিল শনিবারের সকাল। ম্যারিয়া খুব সপ্রতিভ ব্যবহার করার চেষ্টা করে-ছিল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের আভাস আন্তিলিওর কাছে গোপন থাকে নি। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, বন্ধুপত্নীর মুখচোখে সংশয় ও আশঙ্কার চিহ্ন দেখেছিলেন আন্তিলিও। শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে বিল ছিল ব্যস্ত ও উত্তেজিত, স্ত্রীর ভাবান্তর সে লক্ষ্য করল না।

যাওয়ার আগে বন্ধুকে শেষবারের মতো নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন আন্তিলিও। অন্ততঃ এই হাতীটার পিছু নিতে বিলকে তিনি নিষেধ করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা অকারণ নয়—মাতোনির কাছ থেকে এর মধ্যেই পূর্বোক্ত হস্তীর দৈহিক আয়তন ও স্বভাব-চরিত্রের যে বিবরণ আন্তিলিওর কর্ণকুহরে পরিবেষিত হয়েছিল তাতে বন্ধুর নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিল হেসে জানিয়েছিল তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে সে সমর্থ। ঐ ভয়ংকর জীবের পশ্চাদ্ধাবনের সংকল্প থেকে বিলকে নিরস্ত করতে না পেরে আন্তিলিও তার সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে-ছিলেন।

বিল তাঁর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আমি জানি কালই তোমার বায়রা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। অকারণে কারও কাজের ক্ষতি হয় তা আমি চাই না। আমার জন্য দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমি জানি কি করে হাতী মারতে হয়। দুই চোখের একটু উপরে একটা সরলরেখার মধ্যে অবস্থিত দুর্বল জায়গাটা কমলালেবুর মতো বড়—ঐখানে গুলি বসাতে পারলে হাতীর নিস্তার নেই। ত্রিশ ফুটের বেশী দূরত্ব থেকে গুলি চালানো উচিত নয়; অতএব হাতী তেড়ে এলে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এসে পড়ে নির্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে—তাই নয় কি? এসব ব্যাপার আমি জানি। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের সামনে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নিশানা করার ক্ষমতা যে আমার আছে সেকথা তো তোমার অজানা নয়। অতএব বন্ধু, ভয়ের কোন কারণ নেই।"

বিল চলে গেল। আন্তিলিও কর্মসূচী বদলে ফেললেন। যদিও জরুরী কাজে পরের দিনই তাঁর অন্যত্র যাওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল কাজটা এমন কিছু দরকারী নয় যে এই মুহূর্তে হৈ হৈ করে ছুটতে হবে—বরং বিল ফিরে এলে তার সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই বিবেচনার কাজ। স্থান ত্যাগের পরি-কল্পনা বিসর্জন দিয়ে বায়রাতেই থেকে গেলেন আন্তি-লিও এবং টেলিফোন করে ম্যারিয়াকে জানিয়ে দিলেন

বিল ফিরে আসার আগে তিনি এই জায়গা ছেড়ে কোথাও নড়ছেন না।

"তোমার চিন্তার কারণ নেই," আত্তিলিও বললেন, "বিল যে কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে।"

"না! না!" হঠাৎ টেলিফোনের ভিতর দিয়ে ম্যারিয়ার অস্বাভাবিক কণ্ঠ তীব্রস্বরে ফেটে পড়ল আত্তিলিওর কানে, "ও আর আসবে না!"

আত্তিলিও স্তম্ভিত! আবার ভেসে এল নারী-কণ্ঠের দ্রুত উক্তি "ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! আচ্ছা, গুড্-নাইট।"

আত্তিলিও ভাবলেন ম্যারিয়া তাঁর কথা বুঝতে পারে নি, সে বোধহয় ভেবেছে সেই রাতেই বিলের ফিরে আসার কথা বলছেন তিনি, সেইজন্যই এই প্রতিবাদ। অর্থাৎ তার বক্তব্য হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি বিল ফিরে আসতে পারে না।

ম্যারিয়া কি বলতে চেয়েছিল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করলেন আত্তিলিও মঙ্গলবার দুপুরে। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর একটি ছোটখাট দিবানিদ্রা দেবার উদ্যোগ করছেন আত্তিলিও, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

ফোন তুলতেই ম্যারিয়ার কণ্ঠস্বর, "এই মুহূর্তে চলে আসুন।" আত্তিলিও হতভম্ব, "সেকি! কি হয়েছে?"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ওদিক থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল। ম্যারিয়া ফোন রেখে দিয়েছে।

"নিশ্চয় বিল আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে", আত্তিলিও ভাবলেন। তিনি জামা-কাপড় পরে নিজস্ব গাড়ীতে উঠে বসলেন। ড্রাইভার বম্‌বো গাড়ী চালিয়ে উপস্থিত হল বিলের বাড়ীতে। ম্যারিয়া মাথায় হেলমেট চড়িয়ে বারান্দার উপর থেকে পথের দিকে তাকিয়েছিল। কোন ভূমিকা না করে সে আত্তিলিওকে বলল, "বিলের কিছু হয়েছে।"

—"কেন? বিলের কোন খবর পেয়েছ?"

—"খবর পাই নি বলেই বুঝতে পারছি কিছু হয়েছে। বিল কথা দিয়েছিল সোমবারের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে। আজ মঙ্গলবার, অথচ তার দেখা নেই। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নয়, চলুন আমরা যাই। তর্ক করবেন না, দয়া করে চলুন। এক্ষুণি চলুন। এই মুহূর্তে।"

আত্তিলিও বোকার মতো বললেন, "কোথায় যেতে হবে তা তো জানি না।"

উত্তর এল, "আমি জানি। রেনল্ট। ভিলা মাচাডোর রাস্তায় যেতে হলে রেনল্টে যেতেই হবে। ওখানকার গাঁয়ের মানুষের কাছে নিশ্চয়ই ওর খবর পাওয়া যাবে।"

আত্তিলিও বন্ধুপত্নীকে বাড়ীতে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালেন এবং তিনি যে এই মুহূর্তে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ম্যারিয়াকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন সে কথা জানাতেও ভুললেন না। কিন্তু ম্যারিয়া বাড়ী থাকতে রাজী নয়।

"আমি খাবার-দাবার তৈরী রেখেছি। পানীয় জল, কম্বল, 'ফ্ল্যাশ-লাইট' প্রভৃতি সব কিছুই সাজানো আছে। বিলের বাড়তি বন্দুকটাও সঙ্গে নিচ্ছি—হয়তো অস্ত্রটা ব্যবহার করার দরকার হতে পারে। আর এক মিনিটও নষ্ট করা উচিত নয়। চলুন।"

আত্তিলিও বুঝলেন ম্যারিয়া কোন কথা শুনবে না, সে যাবেই যাবে। অগত্যা বন্ধুপত্নীকে নিয়ে তিনি গাড়ীতে উঠে বসলেন। ড্রাইভার বম্‌বো গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ● পথের শেষে

গাড়ী ছুটছে। দীর্ঘ পথ। যাত্রীরা মৌন। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ যাত্রীদের নির্বাক করে রেখেছে। শুধু চালনচক্রের উপর অভ্যস্ত দক্ষতায় ঘুরছে ড্রাইভার বম্‌বোর হাত।

যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। সংকীর্ণ পথের উপর এক জায়গায় পড়ে ছিল একটা গাছ। অনেক কষ্টে সেই বাধা ভেদ করে গাড়ী ছুটল। জোর করে সঙ্গে আসার জন্য বন্ধুপত্নীর উপর বিরক্ত হয়েছিলেন আত্তিলিও, কিন্তু ক্রোধপ্রকাশ করে লাভ নেই—ম্যারিয়া অটল, অবিলম্বে বিলের খবর পাওয়ার জন্য যে-কোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে ৩২নং মাইলপোস্টের কাছে রাস্তা থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গার উপর তাঁবুটা যাত্রীদের দৃষ্টিগোচর হল। তাঁবুতে ঢুকে বিলের দেখা পাওয়া গেল না।

আত্তিলিও ম্যারিয়াকে জানালেন শয্যার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সারারাত ঘুমিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে গেছে, খুব সম্ভব এখনই সে মাতোনিকে নিয়ে ফিরে

আসবে। ম্যারিয়াকে যাই বলুন না কেন বিলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আন্তিলিওর মনেও তখন সংশয় উপস্থিত—বিছানাতে বিলের দেহের ছাপ থাকলেও সে যে কখন শয্যাত্যাগ করেছে সে কথা অনুমান করা সম্ভব নয়।

আন্তিলিওর প্রবোধ বাক্য শুনে খুশী হল না ম্যারিয়া, সত্যিকার অবস্থাটা সে জানতে চায়—ধাতু-নির্মিত যে বাক্সটার মধ্যে বিল খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিল সেই বাক্সের ডালা খুলে মেয়েটি ভিতরে দৃষ্টিপাত করল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চমক! সব কিছুই অটুট অবস্থায় আছে, একটুকরো খাবারও বাক্স থেকে অদৃশ্য হয় নি! অর্থাৎ তিনদিন আগে এখানে পৌঁছেই হাতীর পিছু নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে বিল আর মাতোনি, ফিরে এসে খাদ্যগ্রহণের সুযোগ হয় নি বলেই তাদের খাদ্যসামগ্রী অটুট ও অক্ষত অবস্থায় যথাস্থানে বিরাজ করছে! তিনদিন নিখোঁজ তারা!

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে মানুষ যেমন করে প্রিয়জনের শবাধারের ডালা বন্ধ করে, ঠিক তেমনি করেই বাক্সের ডালা বন্ধ করল ম্যারিয়া। এতক্ষণ পরে মেয়েটির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। বিলের নাম ধরে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে লুটিয়ে পড়ল পরিত্যক্ত শয্যায়, তার দুই চোখ বেয়ে নামল তপ্ত অশ্রু।

আন্তিলিওর জীবনে এমন দুঃসহ রাত্রি কখনও আসে নি। শোকের প্রথম আবেগ কেটে যেতেই ম্যারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে, দারুণ আশায় বুক বেঁধে বার বার ছুটে এসেছে পথের উপর—আবার নিরাশ হৃদয়ে স্খলিত পদক্ষেপে প্রবেশ করেছে তাঁবুর মধ্যে। সমস্ত রাত এবং পরের দিন সকাল পর্যন্ত সে ঐভাবেই কাটিয়েছে। ঐ দীর্ঘসময়ের মধ্যে কোন খাদ্য তো দূরের কথা, এক কাপ চা পর্যন্ত পান করতে রাজী হয় নি ম্যারিয়া। বার বার অনুরোধ করেও তাকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না আন্তিলিও। এক রাতের মধ্যে তিন-তিন-বার নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা হয়েছে, হতচকিত গ্রামবাসীরা বিমূঢ়ভাবে ঘাড় নেড়েছে—না, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা তাদের চোখে পড়ে নি।

দিনের আলো ফুটতেই আবার অনুসন্ধান শুরু হল। একটার পর একটা গ্রাম পরিদর্শন করলেন আন্তিলিও আর ম্যারিয়া। সবশুদ্ধ প্রায় পাঁচ-ছয়টা গ্রামে তাঁরা পদার্পণ করেছেন, সব জায়গায় একই উত্তর—সাদা চামড়ার কোন মানুষের খবর জানে না স্থানীয় মানুষ। অবশেষে ৩৪নং 'মাইলপোষ্টটার' কাছে এসে যে গ্রামটাকে তাঁরা দেখলেন, সেটা ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য।

গ্রাম পরিদর্শন করে যাত্রীরা বুঝলেন দু'দিন আগেও সেখানে লোকজন বাস করতো। হঠাৎ গৃহত্যাগ করে গ্রামশুদ্ধ লোকের বনের ভিতর উধাও হওয়ার কোন যুক্তি সংগত কারণ খুঁজে পেলেন না আন্তিলিও। কিন্তু ম্যারিয়া দৃঢ়ভাবে জানালেন জনশূন্য গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিলের অন্তর্ধান রহস্য। তার ধারণা গ্রামের মধ্যে খুব শীঘ্রই মানুষের দেখা পাওয়া যাবে।

ম্যারিয়ার চিন্তাধারা যে অভ্রান্ত সে কথা প্রমাণিত হল বুধবার সকাল দশটার সময়ে।

ধূলিধূসর ক্লান্ত দেহে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর আবার ৩৪ নং মাইলপোষ্টের কাছে ফিরে এসে যাত্রীরা পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্তির সাক্ষাৎ পেলেন। পূর্বোক্ত মনুষ্যটি কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করছিল, সাদা চামড়ার সামনে আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা তার ছিল না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কিছুমাত্র মর্যাদা না দিয়ে ড্রাইভার বম্বো লোকটিকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে যাত্রীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটি স্থানীয় মানুষ, নাম—জাটা। জাটার চোখে-মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। প্রথমে সে কোন কথা বলতে রাজী হয় নি, কিন্তু ম্যারিয়ার অবস্থা দেখে তার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হল। আতঙ্কের পরিবর্তে স্নিগ্ধ কোমল অভিব্যক্তির ছায়া পড়ল জাটার মুখে, "চলো।"

সম্মোহিতের মতো জাটাকে অনুসরণ করল ম্যারিয়া। প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর একটা ফাঁকা জায়গার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় মানুষ, তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি এখন আন্তিলিওর দিকে। হঠাৎ জাটার পাশ দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল ম্যারিয়া। এত তাড়াতাড়ি সে পা চালিয়েছিল যে, আন্তিলিও কিংবা নিগ্রোটি তাকে বাধা দেবার সুযোগ পেলেন না।

নারীকণ্ঠের অবরুদ্ধ আর্তস্বর শোনা গেল; আন্তিলিও ছুটে গেলেন ম্যারিয়ার দিকে। পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ।

আন্তিলিওর সম্বিৎ ফিরে এল যখন তিনি দেখলেন ম্যারিয়ার দেহ রক্ত-চিহ্নিত মাটির উপর লুটিয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তিনি মূর্ছিতা বন্ধুপত্নীর পতনোন্মুখ দেহটাকে ধরে ফেললেন। এতক্ষণে সন্ধান-পর্ব শেষ! সামনেই মাটির উপর জমাট শুষ্ক রক্তের ছড়াছড়ি এবং সেই শোণিত-চিহ্নিত ভূমিতে পড়ে আছে দুটি বিকৃত, নিষ্পিষ্ট, ছিন্নভিন্ন মনুষ্যদেহ—বিল আর মাতোনি!

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

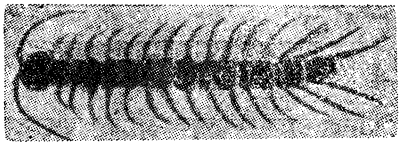

বৃশ্চিক

● অবনীভূষণ ঘোষ ●

চেলাবিছা

বিছা, যার অন্য নাম 'বৃশ্চিক', তোমরা সকলেই দেখেছ। সাধারণভাবে আমরা বলি, বিছা দু-ধরনের। কাঁকড়া-বিছা আর চেলাবিছা। কাঁকড়ার মত দাঁড়া আছে, তাই কাঁকড়াবিছা; আর চেলাকাঠের মত চেপটা চেহারা, তাই চেলাবিছা। বাংলা ভাষায় দুয়েরই ক্ষেত্রে বিছা কথাটা ব্যবহৃত হলেও জীববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এ দুটি প্রাণী একই ধরনের নয়—দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক।

গরম কাল। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। পলাশপুর গাঁয়ের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠছে দীপ, শোনা যায় শঙ্খ-ধ্বনি। গাঁয়ের মোড়ল হারু মণ্ডল। তার ছোট মেয়ে গীতা। মুখ মুছবে বলে দড়িতে ঝোলান ভিজে গামছাটা টানতেই 'বাবা রে! মা রে!' বলে চিৎকার।

চিৎকার শুনে ছুটে আসেন হারু, গীতার, মা।

কি হয়েছে? কি হয়েছে মা?—হারু মণ্ডল জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কে উত্তর দেবে! গীতা কেবল কাঁদতেই থাকে। আর সে কি লাফালাফি! বলে—ভীষণ যন্ত্রণা করছে...ভীষণ যন্ত্রণা করছে!

কেউ বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কি?

মণ্ডল মশায়ের ছেলে রতন। কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। গরমের ছুটি। বাড়ি এসেছে। বাগানে নিড়ানি দিয়ে গাছে জল দিচ্ছিল। বোনের চিৎকারে সেও ছুটে আসে। বুদ্ধি করে গামছার একটা কোণ তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে কি যেন পড়ে যায়।

সকলে ভীতচকিত হয়ে দেখে একটা কাঁকড়াবিছা! তাহলে কাঁকড়াবিছাই কামড়েছে।

কাঁকড়াবিছা তোমরা অনেকেই দেখেছ। কিন্তু তার দেহের গঠন ভালভাবে লক্ষ্য করেছ কি? কাঁকড়াবিছার দেহের তিনটি প্রধান অংশ—মাথা আর তার সঙ্গে লাগান সাঁড়াশির মত দুটো দাঁড়া; ধড়ের উপরের অংশ যার দুপাশে নিচের দিকে থাকে দু জোড়া করে চার জোড়া পা; আর ধড়ের নিচের অংশ বা তলপেট—যাকে বলি আমরা কাঁকড়াবিছার লেজ।

কাঁকড়াবিছা

লেজটির ছটি সুস্পষ্ট ভাগ, আর সর্বশেষ ভাগটি শেষ হয়েছে একটা ফাঁপা বাঁকান হুলে। হুলই কাঁকড়াবিছার প্রধান হাতিয়ার। কাঁকড়াবিছার মাথার সঙ্গে লাগান যে দাঁড়ার কথা বলেছি আর যে দাঁড়া দেখে আমরা খুব ভয় পাই, তা দিয়ে সে মানুষ বা অন্য কোন বড় জানোয়ারকে আঘাত করে না। ঐ দাঁড়া দিয়ে কাঁকড়াবিছা মাত্র ছোট পোকা-মাকড় ধরে। আর মুখ দিয়ে তাদের দেহের রস চুষে খায়। কাঁকড়াবিছার কামড়ের.....বৃশ্চিক-দংশনের যে যন্ত্রণার কথা আমরা বলি, তা তার কামড়ের যন্ত্রণা নয়। লেজের হুল সে ফুটিয়ে দেয় আমাদের দেহে। তাতেই ভীষণ যন্ত্রণা হয়। হুলের গোড়ায় আছে দুটি গ্রন্থি। সেখানে তরল বিষ তৈরী হয়ে জমা হয়। কাঁকড়াবিছা কাউকে হুল ফুটালে সেই বিষ ফাঁপা হুলের ভিতর দিয়ে এসে দেহের রক্তে মিশে যায়। তাতেই হয় এত যন্ত্রণা! হুলটি কাঁকড়াবিছা সচরাচর ঘুরিয়ে পিঠের ওপর রাখে—শিকারকে আঘাত করার সুবিধা হবে বলে।

কাঁকড়াবিছা বাচ্চা দেয়। নবজাত বাচ্চারা মায়ের পিঠে চেপে বসে থাকে—কমবেশি সাতদিন থাকে। তারপর নেমে এসে নিজের ক্ষমতায় চরে বেড়ায়।

মানুষের সঙ্গে কাঁকড়াবিছার শত্রুতা নেই। কিন্তু কাঁকড়াবিছা এমন জায়গায় সাধারণত থাকে যেখানে অতর্কিতে আমাদের হাত বা পা তার গায়ে লেগে যায়। তখন সে ভয়ে দেয় হুল ফুটিয়ে। খুব গরমের সময় ভিজা গামছায় বা ঘরমোছা ন্যাতায় কাঁকড়াবিছা কখনও কখনও আশ্রয় নেয়। চৌকাঠের পাশেও অনেক সময় শুয়ে থাকতে দেখা যায়। জুতোর মধ্যেও ঢুকে লুকিয়ে থাকে। সেই জুতো পরে কাঁকড়াবিছা দ্বারা হুলবিদ্ধ হয়েছে, এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে। বিছানাপত্রেও ঢুকে থাকে। ঠাণ্ডার সময় উনুনের গরম ছাইতেও আশ্রয় নেয়। অন্যমনস্ক হয়ে কেউ হয় তো উনুন পরিষ্কার করতে গেল। দিল তাকে হুল ফুটিয়ে। ঘুঁটের গাদাও কাঁকড়াবিছার একটি ভাল

আশ্রয়স্থল। যে সব স্থানে কাঁকড়াবিছার উপদ্রব খুব বেশি, সেখানে তরল ডি-ডি-টি ওষুধ পুরু করে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—তাতে উপদ্রব অনেকটা কমবে। কাঁকড়াবিছা রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করে। সুতরাং সে সময় সতর্ক হওয়া দরকার।

গণেশ মাহাতো কলকাতা শহরে বেড়াতে, এসেছিল। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সে একটি আঙটি দেখিয়ে সকলের কাছে গল্প করে—এটি অষ্টধাতুর আঙটি। বিচ্ছুর যম। এই আঙটি হাতে থাকলে কাঁকড়াবিছা আর দংশন করতে পারে না। ইয়া-ইয়া বড় সব কাঁকড়াবিছা। হুলও তাদের খুব বড়। ওস্তাদ আমার আঙুলে এই আঙটি পরিয়ে একটা কাঁকড়াবিছা হাতের তেলোতে রেখে দিল। মশায়ের আর তেমন নড়ন-চড়ন নেই! তার হুলও যেমন ছিল, তেমনই পিঠের উপর রয়ে গেল। অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী এই আঙটি। এমনই গুণ! আমি কিনে এনেছি।

তোমাদের কেউ কেউও এই আঙটি বিক্রি হতে দেখে থাকবে। এই আঙটি অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী কিনা জানি না। তবে এই আঙটি পরে কখনও কাঁকড়াবিছার গায়ে হাত দিতে যেও না। রক্ষে থাকবে না। আঙটি যারা বিক্রি করে, তাদের কাঁকড়াবিছাগুলো খুব বড়, সে কথা সত্যি। কাঁকড়াবিছাগুলোর হুল থাকে, সে কথাও সত্যি। অষ্টধাতুর আঙটি পরে হাতের তেলোতে ঐ কাঁকড়াবিছা রাখলে কিছু বলে না, সে কথাও সত্যি। তবে তা আঙটির গুণ নয়। কাঁকড়াবিছার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সপ্তাহ তিনেক কিছু না খাইয়ে রাখলে কাঁকড়াবিছা হুল ফুটাতে ভুলে যায়—কাউকেও হুল ফুটায় না। আঙটি বিক্রেতার কাঁকড়াবিছাগুলোও সেরকমই।

কাঁকড়াবিছা হুল ফুটালে খুব যন্ত্রণা হয়। তবে বয়স্ক লোক কদাচিৎ মারা যায়। সাধারণত ছোট ছেলে-মেয়েদেরই বিপদ। তবে হুল ফুটালেই তা বিপজ্জনক হয় না। একটু যন্ত্রণা হয়ে আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে যায়। হারু মণ্ডলের মেয়ে গীতার যন্ত্রণা আপনা-আপনি সেরে গেছল। তবে যন্ত্রণা যদি না কমে তবে ঘরোয়া ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমে ক্ষতস্থানের কিছু উপরে দিতে হবে একটা বাঁধন—যাকে আমরা তাগা বাঁধা বলি। যন্ত্রণা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে এ বাঁধন। তাগা প্রাণপণ জোরে বাঁধবার দরকার নেই, সামান্য জোরে বাঁধলেই চলবে।

ক্ষতস্থান সামান্য চিরে ফেলে একটু রক্ত বের করে দিতে হবে। বেশি চিরে ফেলা না হয় যেন। ছুরি ক্ষুর বা অন্য যে কোনও একটা ধারাল অস্ত্র দিয়ে ক্ষতস্থান চেরা যেতে পারে। চেরার আগে সেই অস্ত্রটি আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে অথবা কিছুক্ষণ গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে।

লিকার অ্যামোনিয়া নামে যে তরল ওষুধ আছে, তা দিয়ে ক্ষতস্থান বেশ ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

লিকার অ্যামোনিয়া না থাকলে পটাসিয়ম পার-ম্যাঙ্গানেট অথবা সোহাগা সংগ্রহ করে বেশ খানিকটা জলে পাতলা করে গুলে তা দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। এসব ওষুধও না পাওয়া গেলে পেঁয়াজ—বিশেষ করে ছোট জাতের পেঁয়াজ দু ফালা করে কাটা দিকটা দিয়ে ক্ষতস্থান ঘষা যেতে পারে। এতেও উপকার হবে। হাতের কাছে পেঁয়াজ না থাকলে চুনও লাগান যেতে পারে।

কাঁকড়াবিছা সাধারণত হুল ফুটায় পায়ে বা হাতে। সুতরাং তাগা বাঁধার কোন অসুবিধা হয় না। কাঁকড়াবিছা যদি এমন জায়গায় হুল ফুটায় যেখানে তাগা বাঁধা যায় না, সেক্ষেত্রে মাত্র ক্ষতস্থান সামান্য চিরে যথারীতি ওষুধ লাগাতে হবে।

চেলাবিছা

অন্ধকার রাত। বৃদ্ধ হরপ্রসাদ চক্রবর্তী বাড়ির উঠানটা পার হচ্ছিলেন। হাতের মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় দেখেন, মস্ত বড় এক তেঁতুলেবিছা সুড়সুড় করে যাচ্ছে। আর একটু হলেই তাঁকে কামড়ে দিত! পায়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে। চেহারা দেখে মনে হয় পাকা তেঁতুলবিচি যেন পরপর সাজিয়ে রেখেছে কে! তেঁতুলবিছা চেলাবিছা জাতের ।

চেলাবিছার দেহ লম্বা ও পেটটা। কতকগুলি খণ্ডাংশ যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও শেষ তিনটি খণ্ডাংশ ছাড়া আর সব খণ্ডাংশে একজোড়া করে পা রয়েছে। প্রথম খণ্ডাংশে পায়ের বদলে মাথার পিছনে দুদিকে একটি করে দুটি ফাঁপা বিষদাত থাকে। বিষদাতা দুটি গোড়ার দিকে যেখানে এক হয়ে গেছে, সেখানে থাকে বিষগ্রন্থি। চেলাবিছা বিষদাত দিয়ে কাউকে দংশন করলে বিষগ্রন্থি থেকে বিষদাঁড়ার ভিতর দিয়ে বিষ এসে তার রক্তে যায় মিশে। তাতেই যন্ত্রণা হয়। অনেকগুলি পা থাকায় চেলাবিছাকে শতপদীও বলে।

[শেষাংশ ৬৯১ পৃষ্ঠায়]

অজেয় রায়ের গল্প

এ সংসারে কত ছেলে তো বেঁচে বর্তে হেসে খেলে দিন কাটায়, কিন্তু পানুর কেসটা একটু আলাদা। পানু যেন কোনো রকমে টিকে আছে। পানুর দেহের কয়েকটা যন্ত্রপাতিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। একটু অসাবধান হলেই নাকি বিগড়োবে। তাই তাকে সব সময় সাবধানে থাকতে হয়। ছেলেবেলায় অনেকদিন সে সর্দিকাশি আর পেটের রোগে ভুগেছিল। ভুগে ভুগে শরীর হয়েছিল যেন কাঠির মাথায় আলুর-দম। মা ঠাকুরমার অনেক যত্নে প্রাণপাখিটি রক্ষে পেয়েছিল। তাদের কড়া নজর আজও পানুকে আগলে রাখে। নইলে একটু অনিয়ম করলে আর দেখতে হবে না।

বিকেলে পাড়ার ছেলেরা সামনের পার্কে খেলতে যায়। পানুর কিন্তু প্রায়ই মাঠে যাওয়া হয় না। অন্ততঃ মাঠে গেলেও খেলা হয় না। ফুটবল গ্রীষ্ম-বর্ষার খেলা। পানু ফুটবল খেলতে বড় ভালবাসে। কিন্তু কি করে খেলে? যেদিন দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে বা আকাশে মেঘ কালো করে আসে, পানুর আর খেলার মাঠে যাওয়া হয় না। ভিজলে যদি ঠাণ্ডা লাগে? তখনই বৃষ্টির ভয় না থাকলেও যদি আগে বৃষ্টি হয়ে মাঠে কাদা জমে। তাহলেও খেলার হুকুম নেই। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে পানু সেদিন কাদা গ্রাউণ্ডে বন্ধুদের হুটোপাটি দেখে আর চেঁচিয়ে উৎসাহ দেয়। কেউ ওপন-নেট গোল মিস করলে উত্তেজনায় ডান আঙুলে বাঁ হাতের মাদুলীর গোছা আঁকড়ে ধরে। এটা তার অভ্যেস। এক এক সময় ভাবে—দুত্তোর নেমে পড়ি। কিন্তু আবার ভয় হয়। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে সে বুঝেছে, জল-কাদা ঘাঁটা, ঠাণ্ডা লাগানো তার পক্ষে মারাত্মক ব্যাপার। তাই সে ঘোর গ্রীষ্ম ছাড়া সারা বছরই গরম জলে চান করে। খেলার শেষে বন্ধুদের সাথে ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে খানিক যে আড্ডা দেবে তার উপায় নেই। অন্ধকার হবার আগেই বাড়িমুখো চলতে হবে। একটু দেরি হলেই ঠাকুমা বললেন,' ও পানু, এতক্ষণ কোথায় ছিলি হিমে? এ ছেলেকে নিয়ে আর পারি না বাপু।'

এই তো সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ঢুকে পানু ভাবে, সত্যি এতক্ষণ বাইরে থাকা উচিত হয় নি। ক'দিন বৃষ্টি হয়ে একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। গলাটা মনে হল কেমন ধরা ধরা। নাকটা কবার ফোঁৎ ফোঁৎ করল। তখুনি গায়ে একটা চাদর জড়ায়। আগুনে হাত সেঁকে। বুক শুকিয়ে যায় ভয়ে। একবার তার সর্দি ধরলে সহজে ছাড়বে না। পরদিন যখন দেখে না, ঠাণ্ডা লাগেনি, ফাঁড়া কেটে গেছে, ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ দেয়। এবার থেকে সাবধান হতে হবে।

পেটটাই বা কি কম যন্ত্রণা দেয় ?

সারা বছর পানু স্পেশাল ডায়াটের ওপর থাকে। সিঙ্গি, মাগুর, কই মাছের হালকা ঝোল। কাঁচকলা সিদ্ধ, পেঁপের তরকারি, দই, এই সব। একটু এদিক-ওদিক হলেই দুর্যোগ। তখন আসে গাঁদাল পাতা। ছানার জল।

বিকেলে খেলার শেষে বন্ধুরা প্রায়ই চীনেবাদামওলা বা ফুচকাওলার সামনে ভিড় জমায়। পানু করুণ চোখে দেখে। কিন্তু ওসব অমৃতে জিব ঠেকাবার উপায় নেই তার। এক একদিন অবশ্য নিজেকে আর সামলাতে পারে না। যেমন গত রোববার। কালু গরম গরম চীনেবাদাম ঝালনুন দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে বলেছিল, 'কিরে পানু দেখবি নাকি, চেখে ?'

পানু কয়েকটা বাদাম চেয়ে ঝালনুন দিয়ে খেয়ে ফেলেছিল।

ব্যস্। বাড়ি যেতে যেতে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। কেন খেলুম? পেটের মধ্যে যেন নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। রাত্তিরে কিছুই প্রায় খেতে পারে না।

মা ঠিক ধরলেন।

'খাচ্ছিস না কেন? কিছু খেয়েছিস বুঝি বাইরে?'

পানু তার অপরাধ স্বীকার করে।

অমনি হৈ চৈ লেগে যায়। মা ডাকেন ঠাকুমাকে —'দেখুন কাণ্ডটা। বাদাম খেয়েছে। তার সঙ্গে ওই বিষ ঝালনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানের জল। হোমিওপ্যাথির গুলি দাওয়াই পড়ে। সকালেও পানুর ভয় কাটে না। স্রেফ ভাগ্যের দয়ায় সে যাত্রা নিস্তার পায়।

তেরো বছরের পানুর ওপর দুই দিদি আছে। তাদের কিন্তু দিব্যি স্বাস্থ্য। সব কিছু খায়। রোদে জলে হিমে ঘোরে। কিসুসু হয় না। তাদের নিয়ে মা ঠাকমার মাথা ব্যথা নেই। যত ভয় এই পানুকে নিয়ে। বিশেষ করে ঠাকুমার সতর্ক দৃষ্টি এই ক্ষীণ-প্রাণ ছোট নাতিটিকে সর্বদা পাহারা দেয়।

পানুকে একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি অনেক পরীক্ষা-টরিক্ষা করে কিছু হজমের ওষুধ দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, ওর শরীরে নাকি বিশেষ রোগ-টোগ নেই। ওসব মনের অসুখ।

—'ভালমন্দ খাও। বেড়াও। দৌড়ঝাঁপ কর। ঠিক হয়ে যাবে।'

শুনে ঠাকুমা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, —'ডাক্তার নয় তো, যমদূত। মুরোদ নেই রোগ ধরার কেবল বড় বড় কথা। বেঁচে থাক আমার পাড়ার তারক হোমোপ্যাথ। ও কেমন মন দিয়ে দেখে। সব রোগের গুষ্টিশুদ্ধু মুখস্ত। চাইলেই ওষুধ দেয়।'

এর পর ঠাকুমা পানুর চিকিচ্ছের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

বাবা মাঝে মাঝে বলেছেন, 'অত আতুপাতু করলে পরে কি করবে? বেটা ছেলে বাইরে ঘুরতে হবে না?'

শুনে মার মুখ গোমড়া হয়ে গিয়েছে। ঠাকুমা ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন, 'দেখ্ খোকা, আমাদের ওপর যদি ভরসা না হয়, এবার থেকে তুই নিজেই ছেলের ভালমন্দর ভার নে। আমরা বাঁচি!'

বাবা বেগতিক দেখে আর কথা বলেন নি।

দিদিরা আড়ালে পানুকে ক্ষেপায়—'ননীর পুতুল। আদুরে গোপাল। মাস্টার পেটরোগা। ফোঁৎ ফোঁৎ কুমার।'

বর্ষার দিনে বড়দি ছোড়দি মুচমুচে মুড়ির সঙ্গে গরম ভাজা সিঙ্গাড়া খেতে খেতে ফিসফিস করে ডাকে—'এই পেনো, খাবি? হ্যাঁরে অত ভয় কিসের? খেয়ে নিয়ে ভুলে যা। এ সব জিনিষ না খেলে জীবন বৃথা, বুঝলি।'

পানুর ভীষণ লোভ হয়। কিন্তু হাত বাড়াতে পারে না। কি জানি, যদি পরে কিছু হয়। তখন মা-ঠাকুমা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে। যা বকুনি খাবে! থাক গে। চোখের জল চেপে পানু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এমনি করেই দিন কাটে। হঠাৎ জানা গেল ছোটমামা আসছেন। এবার তিনি সেজদিদির কাছে মানে পানুর মা-র কাছে উঠবেন।

ছোটমামার আগমন সংবাদে পানুর দুই দিদি তো নাচতে লাগল আনন্দে। ছোটমামা মানেই মজা। ছোটমামা মানেই হৈচৈ, পিকনিক, থিয়েটার, বায়স্কোপ। চিড়িয়াখানা, আইসক্রীম, চপ-কাটলেট।

মা তার এই ভাইটির গল্প প্রায়ই করেন—'মন্টু মানে তোদের ছোটমামা ছেলেবেলায় দারুণ ডানপিটে ছিল। বার দুই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তারপর মিলিটারিতে ঢোকে। বছর পাঁচেক হল মিলিটারি থেকে রিটায়ার করে আসামে কাঠের ব্যবসা করছে।

কিন্তু ছোটবেলার স্বভাব বড় একটা পালটায় নি। বিয়ে থা করে নি। পাহাড়ের কোলে বাংলো বাড়িতে চাকর-রাঁধুনী নিয়ে একা থাকে।'

ছোটমামা শেষবার কলকাতায় এসেছিলেন তিন বছর আগে। আলিপুরে তার বড়দিদির বাড়িতে উঠেছিলেন। এসেই তিনি কলকাতা ও ধারেকাছের যত ভাইপো, ভাইঝি, ভাগনে, ভাগনির দলবল জুটিয়ে টো টো করে বেড়িয়েছিলেন। এমনকি বড়রাও ছোটমামার হাত এড়াতে পারে নি। সক্কলকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিকনিক করেছেন। ঘুরেছেন। পানু যদিও সব জায়গায় ছোটমামার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে পারে নি অর্থাৎ অনুমতি পায় নি, তবে মজা করে সিনেমা গিয়েছিল সে কথা মনে আছে। ছোটমামা আসার নামে অমন গম্ভীর বাবাকেও যেন বেশ খুশি-খুশি দেখাল। কবে আসছে বারকয়েক খোঁজ নিলেন। পানুও খুব খুশি।

ছোটমামা এলেন। ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা। মুখে পাকানো গোঁফ। তার বাজখাঁই গলায় হো হো হাসিতে কড়ি বড়গা কাঁপতে লাগল। হুল্লোড় লেগে গেল বাড়িময়। ছোটমামা যথারীতি ছোটবড় আত্মীয়-স্বজনের দল জুটিয়ে ফেলে হৈচৈ শুরু করলেন। যেমন তিনি হাসেন তেমনি অজস্র গল্পের ফোয়ারা। এমন ফুর্তিবাজ মানুষ পানু কখনও দেখেনি।

ছোটমামা খাইয়ে লোক। নিজে বাজার যান। নিয়ে আসেন পছন্দ মত মাছ, মাংস, তরকারী। তারপর দিদিকে রাঁধবার অর্ডার দেন। একদিন খেতে খেতে তার পানুর ওপর নজর পড়ল।

—'অ্যাই তুই মাংস খেলি না? কি হয়েছে?'

মা বললেন, 'তোদের জন্যে বেশি মশলা দিয়ে মাংস বানিয়েছি, তাই ওকে দিই নি। ওর ওসব পেটে সয় না। ওকে সিঙ্গি মাছ দেব।'

'অ্যাঁ মাংস সয় না।'—মামা অবাক হয়ে তাকান, —'তাহলে থাকিস কি খেয়ে?'

—'ও একটু পেটরোগা, তাই কম মশলার রান্না খায়। ওবেলা মাংসর স্টু করে দেব।'

'চেহারাটা তো সিরিঙ্গেপানা হয়েছে।'—মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ তো ভাল নয়। এই হচ্ছে বাড়বার বয়স।'

'শুধু কি পেটের ব্যামো।'—মা যোগ করেন 'তার সঙ্গে আবার সর্দির ধাত রয়েছে। চেহারা সারবে কি করে?'

—হুঁ, ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

—'দেখিয়েছিলাম। ডাক্তার তো বললে, কিছু রোগ টোগ তেমন নেই। সব খেতে পারে। সর্দিও আপনি আপনি ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু সাহস হয় না। শেষে বাড়াবাড়ি যদি কিছু হয়ে পড়ে। তাই সাবধানে রাখি।'

'হুম।' ছোটমামা আর কথা না বাড়িয়ে খেতে শুরু করলেন।

আসলে তিনি যে পানুর কথা মোটেই ভোলেন নি টের পাওয়া গেল যাবার ক'দিন আগে। রাত্তিরে খেতে খেতে পানুর বাবাকে বললেন—'জামাইবাবু, ভাবছি পানুকে কিছুদিনের জন্যে আমার কাছে চেঞ্জে নিয়ে যাব। জল হাওয়া পালটালে ওর শরীরের উন্নতি হতে পারে। ওর তো দু'একদিনের মধ্যে ইস্কুলে পুজোর ছুটি আরম্ভ হচ্ছে। কি বলেন? আসার সময় আমার চেনা কারো সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দেব।'

বাবার সঙ্গে ছোটমামার আগেই কথা হয়ে ছিল কিনা কে জানে, বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

মা একটু খুঁৎ খুঁৎ করলেন, 'ওর আবার খাবার বড় বায়নাক্কা। সামলাতে পারবি?'

ছোটমামা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'পানুর সব খাওয়া আমি লিস্ট করে নেব। তোমরা কিছু ভেব না। কোনো অনিয়ম হবে না।'

ছোটমামার সঙ্গে যাবার আশায় পানুর মনে ভারি আনন্দ হতে থাকে। ছোটমামার গল্পের সেই পাহাড়, বন, ঝরণা, সেইসব রোমাঞ্চকর জায়গাগুলো এবার সে নিজের চোখে দেখবে। আবার একটু ভয়ও করে।

বন্ধুদের কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে—'হ্যাঁরে, আসামে গাঁদাল পাতা পাওয়া যায়?'

বন্ধুরা জেনে গেছে পানু আসাম যাচ্ছে। মানকে অন্যদের দিকে চেয়ে লুকিয়ে চোখ মটকায়, তারপর বলে ওঠে, 'আরে আসামের গাঁদাল পাতা তো ফেমাস্! ওখানকার গাঁদাল পাতা বেংগলের মতো সরু সরু নয়। মোটা মোটা গাঁদাল লতা, প্রকাণ্ড সব গাছকে পাক দিতে দিতে ওপরে উঠেছে। আর তাতে এক-এক খানা পাতা এই এক ফুট লম্বা।'

পানু একটু আমতা আমতা করে বলে—'আচ্ছা আসামে কি সিঙ্গি মাছ পাওয়া যায়?'

এবার পল্টু লাফিয়ে ওঠে—'সে কি রে, আসামের সিঙ্গি মাছের খবর রাখিস না!

আমার কাকা আসামে ছিল। কাকা বলেছে,

ওখানে নাকি পুকুর ভর্তি সিঙ্গি মাগুর। আর কি সস্তা।'—কালু অভয় দেয়।

বন্ধুদের কথায় পানু মোটামুটি ভরসা পেল। কাঁচকলা, পেঁপে ইত্যাদির খোঁজখবর নিতে সে ভূগোল বই ওলটাল। কলাগাছ জন্মায়। তবে সেটা কাঁচকলা কিনা ঠিক বুঝল না। যাহোক ছোটমামা তো বলেছেন সব ব্যবস্থা করবেন।

পানু শেষে তার মামার সঙ্গে রওনা হল। তার বন্ধুরা বেশ একটু মানসিক অশান্তি ভোগ করতে লাগল। এমন গুলতাপ্পি মেরে ছেলেটাকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পাঠানো বোধহয় উচিত হল না। ওর মামাটা যা আকাট গুণ্ডা। কি জানি কি হাল হবে পানুর।

দু'দিন ট্রেন জার্নি করে পানু ছোটমামার সঙ্গে এক স্টেশনে নামল। সেখানে মামার ড্রাইভার খড়্গ সিং জীপগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রায় ছ'সাত ঘণ্টা মোটরে চেপে তারা সন্ধ্যে নাগাদ ছোটমামার বাড়িতে পৌঁছল। পানুর শরীর তখন ক্লান্তিতে অবসন্ন। কোনো রকমে দুটি ভাতেভাত খেয়ে সে বিছানায় ঢলে পড়ল। অমনি ঘুম।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে পানু দেখল, পাশের খাটে ছোটমামা নেই। জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে পানু মুগ্ধ হয়ে গেল। দূরে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের প্রাচীর। পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ বন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ভোরের আলোয় রাঙা হয়ে গেছে গাছের মাথাগুলো। সামনে অনেকটা সমতল ভূমি। তারপর ক্রমে উঁচু হয়ে জমি উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে। একটা পাহাড়ীদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কিসের জানি ক্ষেত করা হয়েছে ধাপে ধাপে পাহাড়ের গা কেটে। বাংলোর কমপাউন্ড বেশ অনেকখানি। গেট থেকে বাড়ি অবধি রাস্তার দু'পাশে নানারঙের ফুলের গাছ। একটু শীত শীত হাওয়া দিচ্ছে। মুখ হাত ধুয়ে পানুর মনে হল বেশ খিদে পেয়েছে। এমন খড়্গ সিং এসে ডাকল—'খোঁকাবাবু চলিয়ে। সাহাব চায়ের টেবিলে বসে আছেন, ডাকছেন।'

বারান্দায় বেতের টেবিল চেয়ার সাজিয়ে ছোট-মামা বসেছেন। টেবিলের দিকে তাকিয়ে পানুর বুক শুকিয়ে গেল। রুটি, মাখন, জ্যাম, চীজ, কলা আপেল, ডিম আরও কি কি। কিন্তু তার চিঁড়ে দই কোথায়? ছোটমামা তাড়া লাগাল—'কিরে বস্। স্টার্ট। খিদে পায় নি?'

পানু ক্ষীণস্বরে বলল, 'আমার দই চিঁড়ে?'

—'ওঃ হো, ভুল হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োয় মনে নেই। এখন এগুলোই খা। একদিন অনিয়মে ক্ষতি হবে না। আজই চিঁড়ে কিনে আনব।'

নিরুপায় পানু ডিম রুটিই মুখে দেয়।

অবশ্য খেতে খাসা লাগে। একঘেয়ে দই চিঁড়ে আর ছানা খেয়ে খেয়ে যেন মুখ মরে গিয়েছিল। অনেকটাই খেয়ে ফেলে। আর মনে মনে জপেঃ 'হে দুর্গা; হে মা কালী, এ যাত্রায় রক্ষা কর মা!'

ছোটমামা টেরিয়ে টেরিয়ে দেখেন। বলেন—'কি, কেমন লাগছে? কিচ্ছু ঘাবড়াসনে। এখানে এক ডাক্তার আছে—ডক্টর ঘোষ। একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। বিশেষকরে পেটের অসুখ আর সর্দির ব্যামোয় ওর দারুণ হাতযশ। লোকে বলে, বাঘে যখন বুড়ো হরিণ খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তোলে তখন রাত্তিরে লুকিয়ে এসে ঘোষের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ খেয়ে যায়। তবে ওষুধের দাম দেয় কিনা জানি না!'

রেলিংয়ে বসা কয়েকটা চড়ুই পাখির পিলে চমকে দিয়ে ছোটমামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

খাওয়ার পর পানু খড়্গ সিংয়ের সঙ্গে জীপে চেপে শহরে বাজার করতে গেল। বাজারে কোথাও কিন্তু সিঙ্গি-মাগুর বা গাঁদাল পাতা তার নজরে পড়ল না। খড়্গ সিংকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল যে, এসব বস্তুর সে নামই শোনে নি। তার সঙ্গে রসিকতা করছে ভেবে পানু বেজায় চটে গেল। কিন্তু কই খড়্গ সিং তো চিঁড়ে কিনল না।

যাহোক নতুন জায়গা। পাহাড়ীদের হাবভাব, চারপাশের সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে খাবার সমস্যাটা আপাততঃ মন থেকে মুছে গেল পানুর। জীপের রাস্তাটা কি মজার! এঁকে বেঁকে ছোট ছোট টিলার গা বেয়ে গেছে। এক এক জায়গায় পাশে চাইতে ভয় করে। কী গভীর খাদ!

বাড়ী ফিরে পানু নিজেই একটু এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াল। অবাক ব্যাপার—পেটটা যেন খালি খালি লাগছে। এত তাড়াতাড়ি খিদে তার কখনও পায় না। জায়গার গুণ আছে। সকালের ওই সব বস্তু হজম হল কি করে!

চানটান করে পানু খেতে চলল। সিঙ্গি-মাগুর বা কই মাছ পাওয়া গেছে তো? ভাবতে ভাবতে সে খাবার ঘরে ঢোকে। ছোটমামা অপেক্ষা করছিলেন। বললেন—'কেমন লাগল বাজার? নে, বসে পড়্।'

খাবার জিনিসগুলো এক নজরে দেখে নিয়ে পানু

প্রায় টলে পড়তে পড়তে কোনরকমে চেয়ারের কানা ধরে নিজেকে সামলে নেয়। টেবিলের ওপরে রাখা দু' প্লেট সাদা ধবধবে ভাত। আর ভাতের চারপাশে বাটিতে প্লেটে সাজানো পাঁচ-ছ রকম মারাত্মক বিষ। হ্যাঁ, বিষ বৈকি। সোনাবরণ মুগ ডাল, কপির তরকারি, কপির বড়া, চপ, পুডিং—আর ওটা কি? আস্ত একটা মুরগী রোস্ট। উঃ! কি সব সাংঘাতিক কুপথ্য! কিন্তু কি অপূর্ব সুগন্ধই না উঠছে! বুকভরে গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে পানুর। কিন্তু ভরসা হয় না। শুনেছে—ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্। এসবের অর্ধেক যদি তার পেটে যায় তো নির্ঘাৎ অক্কা পাবে। ছোটমামা বললেন—'কি ভাবছিস। বস্।'

পানু চিঁ চিঁ করে বলে, 'এ সব আমি খাব কেমন করে?'

—'ওঃ হো। তোর বুঝি কি সব সিঙ্গি-মাগুর কাঁচকলা ডায়েট। দূর ছাই, দিদির দেওয়া লিস্টটা যে কোথায় হারালাম! তা ওসব জিনিস, বুঝলি, এখানকার বাজারে পাওয়া যায় না। আমি আজই অর্ডার দিচ্ছি। দু'দিনের মধ্যেই ঠিক এসে পড়বে। যতক্ষণ না আসে, এ সবই চালা। ঝাল-টাল নেই। কিচ্ছু খারাপ হবে না। এই তো দই আছে। ওতেই হজম হয়ে যাবে। তাছাড়া—ভয় কি, ডক্টর ঘোষ তো আছে।'

চেনাশোনা সবকটি দেবতার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে এবং ডাক্তার ঘোষের হাতযশের ওপর নির্ভর করে পানু খাবারের দিকে হাত বাড়ায়। আঃ কি খেতে! বাবুর্চি কাঞ্ছার রান্নার হাত সত্যি অপূর্ব। খাওয়াটা বেশ গুরুভার হয়ে পড়ল।

খেয়ে-দেয়ে ঘুম। বিকেলে পানু ভয়ে ভয়ে থাকে। বাড়ীর কাছেই ঘোরে। ছোটমামা যখন বললেন—'পাহাড়ীদের গ্রাম দেখে আসি চ।' তখন ভাবল: 'বলি—থাক আজ।' কিন্তু লজ্জায় বলতে পারল না। যাহোক পথে কিছু হয় নি তাই বাঁচোয়া।

সত্যি বলতে কি, ছোটমামার গল্প শুনতে শুনতে তার ভীষণ পৈটিক বিপদের সম্ভাবনার কথা কখন সে ভুলেই গিয়েছিল। অনেকখানি বেড়িয়ে সন্ধ্যের মুখে যখন ফিরল তখন আবার যেন খিদে খিদে পাচ্ছে। আশ্চর্য!

রাতেও তো সিঙ্গি টিঙ্গি নেই। ওই দুপুরের মতই খাবার বোধহয়। 'যা হয় হবে!'—পানু ভাবল। সত্যি বলতে কি, খাবারগুলোর কথা ভেবে ভয়ের চেয়ে মনে একটু উৎসাহই হতে লাগল।

অবাক কাণ্ড। এমনি ভাবে সাত-আটটা দিন কেটে গেছে। এখনও মামার সিঙ্গি-মাগুরের অর্ডার এসে পৌঁছল না। পানু সকাল-সন্ধ্যা ডিম মাংস পেটপুরে চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য মাছও হয়। তবে রান্না মোটেই বাড়ীর মত পানসে নয়। এত অত্যাচার করেও সে বহাল তবিয়তে আছে। আজকাল ভয়-টয়ও আর তেমন করে না। নেহাৎ কিছু হলে ডাক্তার ঘোষ তো আছেন। বরং পুরনো দিনের খাবারে আবার ফিরে যেতে হবে ভাবলে মনটা দমে যায়।

তবে ঠাণ্ডার ব্যাপারে এখনও পানু বেশ সাবধান। পারতপক্ষে সন্ধ্যের পর বাড়ীর বাইরে থাকে না। চানে গরম জল চাই। কিন্তু ছোটমামার পাল্লায় পড়লে কি স্বাস্থ্যের নিয়ম মানার যো আছে! প্রায়ই তিনি দূরে কোনো চা বাগানে আড্ডা দিতে যান। সঙ্গে পানুকেও নিয়ে যাবেন। ফিরতে রাত্তির হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে সে কোট-সোয়েটার টুপিতে আপাদমস্তক মুড়ে গাড়ীতে বসে থাকে। বাড়ী এসেই উনুনে হাত-পা সেঁকে।

ভোরবেলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে বেরতে চায় না। একটু রোদ উঠুক। কিন্তু মামা প্রত্যেকদিন তাকে জোর করে সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতে নিয়ে যাবেন বেড়াতে। বলেন—'এমন পরিষ্কার হাওয়ায় বুঝলি, খিদে বাড়ে। শরীর ভাল হয়। তোর ঠাণ্ডার ভয়, সর্দিকাশির ভয় ভুলে যা। ঠাণ্ডায় ঘোরা অভ্যেস করলে দেখবি, ঠিক সহ্য হয়ে যাবে। আমারও সর্দির ধাত ছিল ছেলেবেলায়। একজন বলল, সাঁতার কাট, সেরে যাবে। ব্যস্, আরম্ভ করলুম প্রত্যেকদিন ঘণ্টাখানেক জলে ঝাঁপাই করা। কোথায় পালাল সর্দি-ফর্দি! আর জন্মে হয় নি। শোন্, ঠাণ্ডা জলে চান করবি। আর এখানে তো তেমন সুবিধে নেই, কলকাতায় গিয়ে একটা সাঁতারের ক্লাবে ভর্তি হয়ে যাবি।'

বাপরে বলে কি! ছোটমামা মানুষ খুন করতে পারে। পানু সাঁতার কাটার বায়না ধরলে মা-ঠাকুমা যে কি কাণ্ড বাঁধাবে ভেবে পানুর হাসি পায়। তবে এটা ঠিক, একটু আধটু ঠাণ্ডায় ঘুরেও তাকে এ পর্যন্ত বিশেষ ভুগতে হয় নি। সামান্য দু'চারটে হাঁচি দিয়েই পার পেয়ে গেছে। স্রেফ ভাগ্যের জোর, না জায়গার গুণ কে জানে! দেখেশুনে কিঞ্চিৎ সাহসও জাগছে মনে।

ছোটমামা একদিন বলেছিলেন, 'পানু রাতে জঙ্গলে মাচানে বসে জন্তুদের জল খাওয়া দেখবি?'

পানু সভয়ে বলেছিল—'উঁহু।'

দিনের বেলা সে ছোটমামার সঙ্গে অনেক জঙ্গলে ঘুরেছে। সারা দিনটা বনে বনে কাটিয়েছে। কাঠ কাটা দেখেছে। গাছতলায় বসে খেয়েছে। ওখানেই সতরঞ্চি বিছিয়ে ঘুম দিয়েছে। হরিণ দেখেছে কয়েক-দিন। একদিন দেখেছে কয়েকটা বুনো হাতি, অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে গাছের পাতা খাচ্ছে শুঁড় বাড়িয়ে। বনে কত রকম পাখি, প্রজাপতি, পোকা-মাকড়। ছোট-মামা তাদের চিনিয়ে দেন। বনের জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে পানুর এখন খুব কৌতূহল। চিড়িয়াখানার খাঁচার বাইরে এদের দেখা যায় কে ভেবেছিল! ছোট-মামা বলেছিলেন—'দেখবি, রাতে কত রকম জন্তু জল খেতে আসে ঝরনায়। তাদের অনেকগুলো নিশাচর। শুধু রাতে বেরোয়। দিনে দেখতে পাবি না।' পানুর লোভ হয়েছিল। কিন্তু সারারাত হিমে কাটানো? না বাবা, বেশী বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই।

আসার দিন পনেরো পরে একদিন ছোটমামা বললেন, 'পানু আজ রাত্তিরে তুই কি করবি বল্ তো? আজ আমি আর খড়্গ সিং রাত জেগে পাহাড়ীদের ভুট্টা ক্ষেত পাহারা দেব। বুনো শুয়োরের বড্ড উৎপাত হচ্ছে। বেচারাদের শস্য নষ্ট করছে। তুই একলা বাড়ীতে থাকতে পারবি তো?'

ওরে ব্বাস। এত বড় বাড়ীতে একলা কাটানো! পাশের খাটে মামা থাকবে না। পানু রাত্তিরে কত রকম বিদঘুটে আওয়াজ শুনতে পায়। হি হি হায়নার হাসি। আরও কি সব ডাক। একটু ভূতের ভয় আছে তার। কিন্তু সারা রাত বাইরে থাকবে? যদি হিম লাগে?

ছোটমামা তার মনের ভাব বুঝতে পারেন। বলেন —'চ, শিকার দেখবি। টুপি আর কোট পরে থাকবি, ঠাণ্ডা লাগবে না।'

নিরুপায় পানু তাতেই রাজী হয়ে গেল।

ক্ষেতের পাশে একটা উঁচু ঢিপির ওপর তিনজন বসে। আবছা জ্যোৎস্না ফুটেছে। ছোটমামার হাতে বন্দুক। খড়্গ সিং-এর হাতে বড় টর্চ। সবাই নিঃশব্দ। ছোটমামা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। রাত বাড়ে। হঠাৎ খস্‌খস্ শব্দ। কাছেই কতগুলো ছায়ামূর্তি ক্ষেতের মধ্যে ঘুরছে দেখা গেল। ছোটমামা ইশারা করলেন। খড়্গ সিং টর্চের আলো ফেলল তাদের গায়ে। মুহূর্তে গর্জে উঠল বন্দুক।

পানু সভয়ে দেখল, প্রকাণ্ড এক দাঁতালো শুয়োর তীর বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে। তক্ষুণি সে চক্ষু মুদে খড়্গ সিং-এর পিছনে লুকিয়ে পড়ল। আবার কান ফাটানো বন্দুকের আওয়াজ।

খড়্গ সিং চেঁচিয়ে উঠল—'গির গিয়া হুজুর।'

পানু উঁকি মেরে দেখল মাঠের মধ্যে প্রায় তিরিশ হাত দূরে শুয়োরটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অন্য শুয়োরগুলো হাওয়া। ছোটমামা টর্চ জেবলে শুয়োরটাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। বললেন,—'বাঃ ফাইন। বেশ বড় সাইজ। পানু তুই খুব লাকি। যাক্ এখন বাকি রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। ফেলে রেখে গেলে হায়না আর শিয়ালে শুয়োরটাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। শীত লাগছে না কি? একটু গরম কফি খা। খড়্গ সিং ফ্লাক্স থেকে কফি দাও। সবাই খাই।'

শীত কি! উত্তেজনায় পানুর গা থেকে তখন আগুন ছুটছে। রাত আর বেশী বাকি ছিল না। সে সময়টুকু ছোটমামার শিকারের কয়েকটা রোমহর্ষক গল্প শুনে চট করে কেটে গেল। ভোরবেলা দলে দলে পাহাড়ীরা এল দেখতে। জীপ গাড়ীটা ছিল কিছু দূরে। পাহাড়ীদের সাহায্যে শুয়োরটা জীপে তোলা হল। তারপর বাড়ী ফিরল তিনজন।

বাড়ী পৌঁছে সামান্য খেয়েই পানু কম্বলের ভিতর ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল বেলা দশটা নাগাদ।

মনে পড়ল—শিকার। ধড়মড় করে উঠে ছুটল।

বাইরে এসে দেখে, একজন লোক প্রকাণ্ড ছুরি দিয়ে শুয়োরটা কাটছে। ছোটমামা দাঁড়িয়ে আছেন। খড়্গ সিং বলল যে, ফালি ফালি মাংস কেটে নাকি নানা লোককে বিলোনো হবে। ছোটমামা বললেন, 'কি রে পানু, কেমন লাগল কাল?'

'দারুণ।'—বলেই পানুর খেয়াল হয়, সারারাত যে বাইরে ছিলাম ঠাণ্ডা লাগেনি তো? গলাটা কি জ্বালা জ্বালা করছে? মাথাটা কি ভার ভার লাগছে? নাঃ তেমন কিছু বুঝছি না এখনও। আর হলেই বা কি, ডাক্তার ঘোষ তো পালাচ্ছেন না।

পানু আরও দু'সপ্তাহ থাকল ছোটমামার কাছে।

ইতিমধ্যে ছোটমামার দেখাদেখি সে টাটকা ঠাণ্ডা জলে চান করতে শুরু করেছে। একদিন রাত জেগে জন্তুদের ঝরণায় জল খাওয়াও দেখেছে। ইস্ সে যে কি অদ্ভুত দৃশ্য! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, একবারও তার সর্দি কাশি হয় নি। আর সিঙ্গি-মাগুর কাঁচকলার স্বাদ পানু প্রায় ভুলেই গেছে।

খগ্গা সিং একদিন দাঁত বের করে বলল—'খোঁখা-বাবুর হাড্ডিমে মাস লাগছে। সাবধান থাকেন। নহিতো শেরকা নজর লাগবে!'

—'ভাগ বেটা, যত সব বিদ্‌ঘুটে রসিকতা!'

তবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পানু যখন নিজেকে দেখে, সত্যি মনে হয়, গালদুটো যেন একটু ফুলো ফুলো লাগছে।

পানু পরদিন চলে যাবে। ছোটমামা পানুর অনারে এক ফিস্টি দিলেন। খাবার সময় পানু বলল, 'আচ্ছা ছোটমামা, তোমাদের ডাক্তার ঘোষকে তো একদিনও দেখলাম না। অ্যাদ্দিন এখানে থাকলাম।'

ছোটমামা মন দিয়ে একটা মুরগীর ঠ্যাংকে কায়দা করছিলেন। বললেন—'কে ডাক্তার ঘোষ?'

'সেই যে দারুণ ডাক্তার। এখানে থাকেন।'

'ধুস্, ডাক্তার ঘোষ বলে এখানে কেউ থাকে-টাকে না।'—ছোটমামা নির্বিকারভাবে জবাব দেন।

'মানে?'—পানুর চোখ ছানাবড়া।

'মানে স্রেফ বানিয়ে বলেছিলাম। যাতে তুই সাহস পাস।'—ছোটমামা মিটিমিটি হাসেন।

'অ্যাঁ! উঃ ছোটমামা তুমি যে একটা কি সাংঘাতিক।' —পানু হেসে ফেলে।

মানকে, ডবা, পল্টুরা শুনলো আজ সকালে পানু ফিরে এসেছে। আজ ওরা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল অন্য মাঠে। ফিরতে সন্ধ্যে হল। সবাই চলল পানুর সঙ্গে দেখা করতে। কে জানে কেমন আছে বেচারা। শীতের হাওয়া বইছে। এখন নিশ্চয়ই পানু ঘরে থাকবে।

পানুকে ডাকতে তার ছোড়দি বেরিয়ে এসে বলল—'ও তো পার্কে গেছে। অনেকক্ষণ বেরিয়েছে।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বলে কি! এই ঠাণ্ডায় এখনও পানু বাড়ীর বাইরে! ওরা ফিরে চলল। মোড়ের মাথায় দেখল, পানু আসছে।

বাঃ! চেহারাটা তো দিব্যি ফিরিয়েছে! হাফ প্যান্টের সঙ্গে একটা সার্ট পরে পানু গট গট করে আসছিল। ওদের দেখে হেঁকে বলল—'কিরে সব কেমন আছিস? মাঠে গেছলাম, কাউকে পেলাম না। ক্রিকেট নেমেছে তো? কাল থেকে খেলতে যাব।'

পানুর রকম সকমে বন্ধুরা ঘাবড়ে যায়। ডবা আস্তে আস্তে বলল—'শীত পড়েছে, শুধু একটা জামা গায়ে বেরিয়েছিস। ঠাণ্ডা লাগবে না?'

পানু বেশ চটে উঠল—'ওঃ ভারি শীত! যত তোরা পুতুপুতু করে ঠাণ্ডার ভয় করবি তত মরবি। বুকে বল আন্, দেখবি কিসসু হবে না। ঠিক সহ্য হয়ে যাবে।'

পানু প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্মার্ট হয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ উল্টোদিকের ফুটপাতে তাকিয়ে পানু চেঁচিয়ে উঠল—'বাঃ গ্র্যান্ড! ওই দেখ্ সরযূ এসেছে। কদ্দিন ভাজা চীনে বাদাম খাইনি। তোরা কেউ খাবি নাকি?'

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই মানকে, ডবা, পল্টুদের ফ্যালফ্যালে চাউনির সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে সরযূর কাছে গিয়ে হাজির হল পানু।

[৬৮৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সরস্বতীর বীণার মত কাল রঙের চেলাবিছাকে লোকে বলে সরস্বতী বিছা। ছোট নিরীহ বিছা। বিষদাঁড়া খুবই ছোট। মানুষের কোন ক্ষতি করে না, করতে পারেও না। গুবরেবিছাও চেলাবিছা। এত ছোট, বিষদাঁড়াও খুব ছোট, মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। পাঁশুটে রঙের। গোবরের গাদায়, জঞ্জালে, ইটের ভাঙা ঢিবিতে সাধারণত লুকিয়ে থাকে।

তেঁতুলেবিছা বেশ বড় হয়। তার দংশনে বেশ যন্ত্রণাও হয়—যদিও কাঁকড়াবিছার দংশনের মত নয়। কখনও কখনও ক্ষতস্থান লাল হয় আর শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। সাধারণত কমবেশী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ সব লক্ষণ দূর হয়। তেঁতুলেবিছা কামড়ালে ক্ষতস্থানে নরম বা ঠাণ্ডা জলের সেক দিতে হয়। তাতেই যন্ত্রণা কমে যায়। তারপর সেখানে টিংকচার আয়োডিন লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। লিকার অ্যামোনিয়া দিয়েও ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলা যায়। অ্যামোনিয়ার অভাবে পেঁয়াজ কেটে ক্ষতস্থানে ঘষা যেতে পারে।

ময়ূখ চৌধুরীর

সংখ্যার নাম চার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বীর বটে জয়দ্রথ ! একটি নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে যাচ্ছে লৌহমুষ্টি পরিহিত তিনটি যোদ্ধা !
তিনটি নয় হে — চারটি যোদ্ধা। কিঙ্গল ভূমিশয্যা ত্যাগ করেছে।
একবার ব্যর্থ হয়েছি বটে, কিন্তু এইবার ওর নিস্তার নেই — এই আঘাতেই ওকে ধরাশায়ী করব।
আঃ ! এইবার তোকে পেয়েছি রে শয়তান !
ইস্ ! দুরাত্মা কিঙ্গল পিছন থেকে আঘাত করে জয়দ্রথকে ফেলে দিল ! ... ওঃ ! প্রায়-অচেতন মানুষটাকে সবাই মিলে লৌহদস্তানার প্রহারে জর্জরিত করছে ...
নাঃ ! নির্বিকার চিত্তে এমন দৃশ্য দর্শন করা সম্ভব নয় —
উঃ !
আপনার কৃপায় আমার ডান হাত অকর্মণ্য হয়ে অসিধারণে অসমর্থ, কিন্তু বাঁ হাত সম্পূর্ণ সুস্থ এবং কটিদেশের ছুরিকাও সুশাণিত — অতএব আমাকে আপনি বাধা দিতে পারবেন না।
এই বালক বোধহয় আমাকে আর নিরপেক্ষ থাকতে দেবে না।
উঃ ! আপনার দেহে অসুরের শক্তি ! আমার হাত যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে গেছে ! আপনি আমার হাত চেপে ধরলেন কেন ?
জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য তুমি তরবারি হস্তে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলে — তাই বাধা দিলাম।
13

[চলবে]

বিজ্ঞানের যাদুকর

● সুনীলাংশু দাশ ●

আজ থেকে অনেক অনেক কাল আগে সেই যিশু খ্রীষ্টের জন্মের দু'শ বছরের চাইতেও বেশী আগে—সিসিলী দ্বীপে সিরেকাস নগরীতে বাস করতেন তিনি। যেমনি ছিলেন চতুর তেমনি ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল। বিশেষ ক'রে অঙ্ক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। দিন নেই রাত নেই সুযোগ পেলেই বসে যেতেন নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতে। ভাবতেন কী উত্তর হতে পারে তার, কী না পারে। এ-ভাবনার চাইতে মধুময় উত্তেজক আর কোন ভাবনাই যেন ছিল না তাঁর। আর্কিমিডিস আজ বেঁচে থাকলে নির্ঘাৎ একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক হতেন, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম মহান্ আবিষ্কারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম এবং যে-ক'জন শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিকে পৃথিবী এ পর্যন্ত জেনেছে তাঁদের মধ্যে আর্কিমিডিস একজন।

অন্যমনস্ক প্রফেসরদের অনেক মজার মজার গল্প আমরা জানি। কখনো কখনো আর্কিমিডিসও ভীষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়তেন। স্থান বিশেষে মনোনিবেশ করার দরুণ অন্যস্থানগুলিতে মনের বিসদৃশ অনুপস্থিতির কথা যখন আমরা শুনি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে, তখন আমরা প্রায়শঃই পুলকিত হ'য়ে উঠি, বেশ মজা পাই। সমস্যার সমাধান করতে ব'সে সত্য সত্যই আর্কিমিডিস স্নান, আহার ভুলে যেতেন।

রাজার সোনার মুকুটের সেই মজার গল্প তো আমরা সকলেই শুনেছি। গ্রীকরাজ হীরো তাঁর সেকরাকে ডেকে বললেন—আমায় একটা সোনার মুকুট তৈরি করে দাও। এই বাবদে সেকরাকে কিছু সোনাও দেওয়া হ'ল। মুকুট তৈরী হ'তে রাজার সন্দেহ হ'ল, সেকরা নিশ্চয় তাঁকে ঠকিয়েছে। কিছু সোনা সে সরিয়ে রেখে কম দামের ধাতু রূপো সে নিশ্চয়ই মুকুটের কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু তা জানা যাবে কী করে? এত সুন্দর মুকুটটা তো আর তাই বলে ভেঙ্গে দেখা যায় না! তাই ডাক পড়লো রাজসভার বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের। মুকুটটা না ভেঙ্গে বলে দিতে হবে তাতে খাদ আছে কিনা।

আর্কিমিডিস জানতেন যে বিভিন্ন ধাতুর ওজনও বিভিন্ন। এক টুকরো নিরেট সোনার কিউব (ঘনক) একই সাইজের এক টুকরো নিরেট রূপোর কিউব থেকে ভারী। এ সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে একদিন স্নান করবার সময় বাথ্‌টাবে যেই নেমেছেন অমনি লক্ষ্য করলেন পরিপূর্ণ টাব্‌টি থেকে কিছু জল উপ্‌চে বাইরে পড়ে গেল। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ভাববার মত কিছু এতে থাকতে পারে না ঠিকই। কিন্তু আর্কিমিডিস ছিলেন অসাধারণ। তিনি তো ব্যাপার দেখে লাফিয়ে উঠলেন। "ইউরেকা ইউরেকা" (পেয়েছি পেয়েছি) ব'লে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থাতেই ছুটলেন তিনি বাড়ীর দিকে। সমস্যার উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন। বাড়ী ফিরেই শুরু করলেন এক্স্‌পেরিমেন্ট্। একটা পূর্ণপাত্র জল নিয়ে তাতে বিভিন্ন বস্তু ডুবিয়ে দেখলেন বিভিন্ন পরিমাণ জল উপচে বাইরে পড়ছে। রূপোর চাইতে সোনা ভারী বলে এক পাউণ্ড নিরেট সোনার কিউব এক পাউণ্ড নিরেট রূপোর কিউবের চাইতে ছোট। আর্কিমিডিস দেখলেন সোনার কিউব রূপোর কিউবের চাইতে কম পরিমাণ জল স্থান-চ্যুত করে। ব্যস, সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল আর্কিমিডিসের কাছে। তখন রাজার সম্মুখে তিনি প্রমাণ করে দেখালেন মুকুটে রূপোর খাদ রয়েছে। জলপূর্ণ তিনটি পাত্র নিলেন। এক পাত্রে ডুবোলেন মুকুটের সমওজনের সোনা, দ্বিতীয় পাত্রে মুকুটের সমওজনের রূপো, আর তৃতীয়টিতে খোদ মুকুটটিকে। দেখা গেল মুকুটটি যে পাত্রে ডুবিয়েছিলেন সেই পাত্র থেকে অপসারিত জলের পরিমাণ প্রথম পাত্র থেকে অপসারিত জলের পরিমাণের চাইতে বেশী কিন্তু দ্বিতীয় পাত্র থেকে অপসারিত জলের পরিমাণের চাইতে কম। অর্থাৎ কিনা মুকুটটি খাঁটি সোনারও নয়, আবার খাঁটি রূপোরও নয়—উভয় ধাতুর মিশ্রণে তৈরী। রাজার সম্মুখে আর্কিমিডিসের এই এক্স্‌পেরিমেন্টের পর যা হবার তাই হ'ল। প্রবঞ্চনার অপরাধে সেকরার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল।

রাজার সমস্যা সমাধান করাটাই বড় কথা ছিল না। মুকুটটি যে খাঁটি সোনার তৈরী নয়, তা প্রমাণ করতে গিয়ে প্রকৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে ফেললেন আর্কিমিডিস—জলে ডোবালে বিভিন্ন কঠিন দ্রব্য যে-পরিমাণ জল স্থানচ্যুত করে তা

মেপেই সেই সব কঠিন দ্রব্যের ওজন নির্ণয় করা যায়। এই নিয়মকেই আমরা আজকাল আর্কিমিডিসের নিয়ম বা আপেক্ষিক গুরুত্বের নীতি (ল অব্ স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি) ব'লে থাকি। সেই থেকে দু'হাজার বছর পরেও এখনকার বিজ্ঞানীরা তাঁদের বহু হিসাব নিকাশ করবার জন্যে এই নীতির উপরই নির্ভরশীল। আমাদের আধুনিক ডুবো জাহাজও এই নীতি অনুসারেই গঠিত এবং চালিত।

তখনকার আমলের বহু দার্শনিক ও গণিতবিদ্ই থিয়রি চিন্তা ক'রেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তার সঠিকতা প্রমাণ করবার জন্য মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু আর্কিমিডিস তা ছিলেন না। তাঁর মতামত যে কাজে লাগানো যায়, তা প্রমাণ না ক'রে তিনি তৃপ্ত হতেন না।

ডিস্কাভারি আর ইনভেন্শন্ এক কথা নয়। দুটোই আবিষ্কার, ঠিকই। তবে একটি উদ্ঘাটন, অপরটি উদ্ভাবন বা সৃষ্টি। যেটা পূর্বেই ছিল কিন্তু মানুষের জানা ছিল না—সে সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করানই ডিস্কাভারি। আর যে কৌশলের কথা পূর্বে কারো জানা-ই ছিল না এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করাটাই হ'ল ইনভেন্শন্।

উদ্ঘাটন করার চাইতে উদ্ভাবন করাটাই বোধহয় বেশী কৃতিত্বপূর্ণ, যে-জিনিষটা আর্কিমিডিসের যুগে ছিল একান্তই দুর্লভ। পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে আর্কিমিডিস কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনও করলেন। তার একটি হ'ল আর্কিমিডিয়্যান স্ক্রু। একটা বিরাট ফাঁপা সিলিণ্ডারের ভেতর অতিকায় আকৃতির একটা কর্ক্স্ক্রু (ছিপি খুলবার পেঁচালো যন্ত্র)—এই হ'ল সমগ্র যন্ত্রটির রূপ। সিলিণ্ডারের এক প্রান্ত জলে রেখে স্ক্রুটি ঘোরালেই জল ওপরে উঠে আসে।

এই আর্কিমিডিয়্যান্ স্ক্রু-ই উন্নত রূপে আজকাল জলাভূমি নিষ্কাষণে, গোলাঘরে শস্য দানা বহন করবার জন্য ও শিল্প-সংক্রান্ত চুল্লিতে কয়লা তুলবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর্কিমিডিস উদ্ভাবন করেছেন এমন আরো কিছু কিছু মেসিন সম্বন্ধে মজার মজার গল্প রয়েছে। যদিও ঐতিহাসিকরা আজকাল সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে সেই গল্পগুলো আদৌ সত্য কিনা! সে যাই হোক গল্প সত্যি না হ'লেও শুনতে আমরা কে না ভালোবাসি? আর্কিমিডিস একটা মেসিন বানিয়েছিলেন যেটা অত্যন্ত স্বল্প আয়াসে বিরাট ওজনের সব জিনিস নড়াতে পারতো। মেসিনের কাজ দেখাবার জন্য একবার তিনি মাল বোঝাই একটা জাহাজের সঙ্গে একটা শেকলের এক প্রান্ত জুড়ে দিয়ে অপর দিকটা সেই মেসিনটার 'পুলি'-র ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই প্রান্তভাগ ধরিয়ে দিলেন রাজা হীরোর হাতে। তারপর যেই না রাজা শেকলে টান দিলেন অমনি সবিস্ময়ে রাজা দেখলেন যে তিনি অতি সহজে জাহাজটিকে জল থেকে টেনে তুলতে পারছেন! ভারোত্তোলনে আমরা এখন 'পুলি'র ব্যবহার সর্বত্র দেখতে পাই। আর্কিমিডিসই এর উদ্ভাবক।

আরেকটা মজার গল্প হ'ল রোমানরা যখন গ্রীক নগরী সিরেকাস অবরোধ করেছিল তখন গ্রীকরা আর্কিমিডিস আবিষ্কৃত এই মেসিনটিরই পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিল। তারা পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রে আংটা বা হুক্ নামিয়ে দিয়ে আক্রমণকারী রোমানদের জাহাজ হুকে আটকে স্রেফ্ জল থেকে টেনে তুলে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখত অথবা নিচে পাহাড়ে আছড়ে চুরমার করে ফেলত। আর্কিমিডিস পাথর ছুঁড়বার বিরাট বিরাট সব যন্ত্র তৈরি করেছিলেন (আধুনিক সংস্করণে যাকে আমরা গুল্তি ব'লে থাকি), যা' দিয়ে ভারি ভারি পাথর ছুঁড়ে শত্রুপক্ষের জাহাজের প্রভূত ক্ষতি করা হ'ত।

সিরেকাসের লোকেরা দুর্ধর্ষ রোমানদের যে প্রায় তিন বৎসরের জন্য সিরেকাস নগরীর বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তা একমাত্র এই আর্কিমিডিসের জন্যই। লোকবলের দিক থেকে সিরেকাস দুর্বল ছিল ঠিকই, কিন্তু আর্কিমিডিস ছিলেন সিরেকাসের বিরাট একটি সম্পদ—তাঁর বুদ্ধিই ঠেকিয়ে রেখেছিল রোমানদের।

বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বেশীরভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাজই আর্কিমিডিস করে গেছেন অঙ্কশাস্ত্রে। তখনকার দিনে বৃত্তের সঠিক ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে কেউ সক্ষম হন নি। আর্কিমিডিস অত্যন্ত বিস্ময়কর রূপে তা নির্ণয় করবার নির্ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

চমৎকার সব বইও লিখেছিলেন জ্যামিতির বিভিন্ন ফিগার সম্বন্ধে যা আমরা স্কুলে জ্যামিতি বইয়েতে পড়েছি—যেমন কোণ্, স্পাইর‍্যাল্, প্যারাবোলা, প্লেন্, স্ফীয়ার্, সিলিণ্ডার্ ইত্যাদি। স্ফীয়ার্ ও সিলিণ্ডার-এর ক্ষেত্রফল ও ঘনফল পরিমাপ বিষয়ক বই-ই তাঁর

শ্রেষ্ঠ অবদান। এটাই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সে-সম্বন্ধে আর্কিমিডিস নিজেও এত সচেতন ছিলেন যে, সিলিণ্ডারের ভেতরে স্ফীয়ারের নক্‌শা দিয়ে তাঁর সমাধিপ্রস্তর চিহ্নিত করতে তিনি তাঁর বন্ধুদের ব'লে গিয়েছিলেন।

অঙ্কশাস্ত্রেরই একটা সমস্যার সমাধান করতে করতেই আর্কিমিডিসের জীবনসন্ধ্যা নেমে এল একদিন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ২১২ অব্দে। সিরেকাস নগরীতে তখন সদলবলে ঢুকে পড়েছেন রোমান সেনাপতি মার্সিলাস। আর্কিমিডিস সম্বন্ধে মার্সিলাস সবকিছুই ইত্যবসরে জেনেছিলেন। সৈন্যদের হুকুম দিলেন—যেভাবে পার খুঁজে বার ক'রে সেই চতুর বৃদ্ধটিকে আমার সামনে নিয়ে এসো। কিন্তু দেখ, তাঁর যেন কোন অনিষ্ট না হয়।

একদিন এক রোমান সৈন্য খুঁজে পেল আর্কিমিডিসকে। সে দেখল, আর্কিমিডিস মাটিতে ব'সে আছেন। ব'সে ব'সে বালিতে দাগ কেটে কী সব করছেন। নিজের চিন্তায় তিনি এতই মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, ভুলে গিয়েছেন শহরে রোমান সৈন্যরা ঢুকেছে। তাই সামনে দণ্ডায়মান রোমান সৈন্যটিকে দেখে বিরক্তই হলেন। বালিতে আঁকা বৃত্তগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, দেখ বাপু, এই বৃত্তগুলোর কিছু গোলমাল করো না। একটু সরে দাঁড়াও।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ রোমান সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে ধড় থেকে তাঁর শির বিচ্ছেদ হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো সেই দাগ কাটা বালির উপরেই—সমস্যার সমাধান করতে করতেই চির-সমাধি লাভ করলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস।

সাবধান! আবার ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আসন্ন!!

● *এবারের ঘূর্ণি আরো ব্যাপক, আরো গভীর ঃ*

ডিএনবিএ-র সর্বশেষ সংবাদ ●

প্রখ্যাত প্রকাশনসংস্থা ডিএনবিএ ব্রাদার্স জানাচ্ছেন, বিগত ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিনের মাঝামাঝি শারদীয়া কিশোর ভারতীর বুকে যে দুরন্ত 'নীল ঘূর্ণি' আত্মপ্রকাশ করে এবং যে ঘূর্ণিঝড়ে কিশোর-তরুণ-নবীন-প্রবীণ বাঙালী পাঠকমাত্রই প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত হন, মুদ্রণ-অফিস অতিক্রম করে অচিরেই তা আর একবার পাঠকসমাজের উপর নেমে আসবে পুস্তক আকারে। ডিএনবিএ-র দৃঢ় বিশ্বাস—এবারের 'নীল ঘূর্ণি'র প্রকোপ সেবারের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, কারণ এবার তা আসছে অন্যূন দ্বিগুণ বর্ধিত অথচ সংহত আকারে। প্রথম আত্মপ্রকাশের পর 'নীল ঘূর্ণি' পাঠকমহলে যে দুর্বার আলোড়ন এনেছিল, তার খুব বেশী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে ডিএনবিএ সন্ত্রাস জাগাতে অনিচ্ছুক, শুধু প্রথিতযশা কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সুদীর্ঘ একখানি পত্রের সামান্য একটুখানি উদ্ধৃত করে তাঁরা এই প্রসঙ্গের আপাতত ইতি টানতে চান। যাঁর সূক্ষ্ম জাদু-লেখনীমুখ থেকে সুবিশাল 'নীল ঘূর্ণি'র মহা-উৎসার সেই স্বনামধন্য দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কবি লিখেছেন ঃ "**'নীল ঘূর্ণি' তোমাকে অমর করে রাখবে। বিস্ময়কর উপন্যাস। নীলবিদ্রোহের ইতিহাসকে তুমি তোমার লেখায় জ্বলন্ত রূপ দিয়েছ।... ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভিশাপ-ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও 'নীল ঘূর্ণি' একখানি প্রাণবন্ত দলিল। ফকিরদাদু আর কাশীনাথ, এই দুই গুরু-শিষ্যের প্রতীকী চরিত্র দুটি এদেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান কিশোরের মনে বিপুল প্রেরণা জাগাবে।.....**"

এ মাসেই প্রকাশিত হচ্ছে

সিপ্রা বিশ্বাস-স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতায়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

মায়ের মত আর কে আছে?

● **অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়** ●

অনেক ছাত্রের কোলাহল। সবাই ব্যস্ত—অস্থির। চিন্তার ছায়া সবার চোখে—কী হবে?

একটু আগে হেডমাষ্টারমশায় জানিয়েছেন পরীক্ষার ফল এসে পৌঁছেছে, এখনি নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে-ই সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অফিস ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন ক্লার্ক গিরীজাবাবু আর দপ্তরী শশী। শশীর হাতে একটা ছাপানো কাগজ। নোটিশ বোর্ডে আঠা দিয়ে সেটে শশী আর গিরীজাবাবু চলে গেলেন। আবার একটা কোলাহল শুরু হ'ল ছাত্রদের মধ্যে। দীর্ঘ তিনমাসের প্রতীক্ষা শেষ হতে চলেছে।

ছেলেরা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লে নোটিশ বোর্ডের ওপর।

'অতনু, অতনু স্কলারশিপ পেয়েছে।'—একসঙ্গে অনেকে চেঁচিয়ে উঠল।

সবার থেকে দূরে—লাইব্রেরী ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল অতনু। সবাই অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। এত ভাল করল অতনু! ভাবা যায় না যে!

শশী আবার এল। —'অতনু সেনকে মাষ্টারমশায় ডাকছেন।'

দুরুদুরু বুকে হেডমাষ্টারের ঘরে ঢুকলে অতনু। প্রথমেই নীচু হয়ে প্রণাম করলে মাষ্টারমশায়কে।

হেডমাষ্টার হীরেনবাবু বুকে টেনে নিলেন ওকে। —'এই প্রথম! স্কুলের তিরিশ বছরের ইতিহাসে তুমিই প্রথম স্কলারশিপ পেয়েছ। খুব খুশী হয়েছি। এই নাও।'—মার্কশীটটা এগিয়ে দিলেন মাষ্টারমশায়।

অতনু কি ভুল দেখছে? অঙ্কে একশ' বিরানব্বুই—ফিজিক্সে একশ' পঁচাত্তর—কেমেষ্ট্রীতে—

—'এবার কী পড়বে?'

—'দেখি স্যার।'

'দেখবে কী? কিছুই কি ভাবো নি?'

কী ভাববে অতনু? ও কি ভাবতে পেরেছিল এত ভাল রেজাল্ট হবে?—'ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে আছে।'

—'ভাল। আরো ভাল কর ভবিষ্যতে।'

আর একবার তাকে প্রণাম করে অতনু বেরিয়ে এল।

বাইরে ছাত্ররা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। শুধু-ই কি বিস্ময়? একটু সন্দেহ—একটু ঈর্ষার কাঁটা কি চক্‌চক্ করছে না ওদের চোখে? না তাকিয়েও অতনু তা' বুঝতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে লোহার গেটটা খুলে।

বাড়ী এসে প্রথমে-ই অতনু দাঁড়ায় মায়ের ছবিটার সামনে।

—মা, মাগো! তুমি জানলে না আমি ভাল হয়েছি —আমি স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছি।

—'অতনু, অতনু।'—বাইরে বড় মামার গলা পাওয়া গেল।—'কোথায় গেল হতভাগাটা! জুতোটা পালিশ করে রাখতে বলেছিলাম সকালবেলা। বাবু এখনো সময় পেলেন না।'

অতনুর মনে পড়ে গেল বড় মামা আজ নেমন্তন্নে যাবেন। মামা অফিসে বেরুবার আগে নতুন জুতোজোড়া পালিশ করে রাখতে বলে গিয়েছিলেন। অতনু ভুলে গিয়েছিল। মার্কশীটটা টেবিলের ওপর ফেলে জুতো পালিশ করতে ছুটল অতনু।

মামারা খবর-ই রাখেন না অতনুর আজ রেজাল্ট বেরুবে।

বড়মামার বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট মাসীর কলেজের বন্ধুরা আসে। আবার ডাক পড়ে অতনুর।—'অতনু অতনু। ভাল মিষ্টি নিয়ে আয় তো।'

অবশেষে রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে একটু অবসর পায় অতনু। এসে দাঁড়ায় মায়ের ছবির সামনে। যে মা অতনুর জীবন থেকে হারিয়ে গেছেন তিনমাস আগে। মা কোথায় গেছেন অতনু জানে না। যে পথের শেষ নেই—শুরুও নেই—যেপথে ছড়িয়ে থাকে অপার শান্তি—অসংখ্য তারার আলো, সেই অদৃশ্য ছায়াপথের যাত্রী হয়ে মা চলে গেছেন এক অদৃশ্যলোকে। যেখানে সুখ নেই—দুঃখ নেই—চিন্তা নেই—ভাবনা নেই—কী আছে, তা-ও কেউ জানে না।

অতনুর মনে পড়ে যায় মায়ের শেষ দিনগুলোর কথা। মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত—সেই শেষ সময়ে একবার ডাক্তার ঢুকেছিল এই ঘরে। বড়মামা ডেকেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার মাকে দেখেন নি। বলেছিলেন, আবার

আমাকে ডাকলেন কেন? কোন প্রয়োজন-ই ছিল না।'

বড়মামা লজ্জা পেয়েছিলেন। আর অতনুর চোখে ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে উঠেছিল একটা ঘৃণা।

যেদিন টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছিল, মা শুয়ে শুয়ে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যারে, ফীসের জন্য কত টাকা লাগবে?'

অতনু মুখ ব্যাজার করে বলেছিল, 'তিন মাসের টিউশ্যন ফী আর একজামিনেশন ফী। সব মিলিয়ে সত্তরটাকা।'

বড়মামার হঠাৎ একটা বাজে খরচ হয়ে গেল সেই মাসে, মেজমামাকে শালীর বিয়েতে জড়োয়ার গয়না দিতে হ'ল, ফলে ফীসের টাকা তাঁরা দিতে পারলেন না।

আর, বড়মামী আড়াল থেকে বললেন, কী হবে ওই ছেলের ফীস্‌ দিয়ে? ওকি পাশ করবে নাকি?

মেজমামী বললেন, 'টাকাগুলো জলে যাবে।'

সব শুনল অতনু। মা-ও শুনলেন সব। মার বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

মেজমামার ছেলেটা সেদিন কী করে যেন অতনুর কোল থেকে পড়ে গেল। মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। বড়মামা এই মারে তো সেই মারে। মেজমামা বললেন, 'অতনু এটা ইচ্ছা করে করেছে। ফীসের টাকা না-দেবার শোধ নিল ওই শিশুটার ওপর।' বড়মামী ওকে বাড়ী থেকে বের করে দেবার পক্ষে রায় দিলেন। মেজমামী বললেন, 'পুলিস ডাকা হোক।'

অতনু ঠিক করলে বড়মামার নতুন স্যুটটার পকেটে আরশুলা ঢুকিয়ে দেবে পরদিন।

রাত্রিবেলা মা ডাকলেন অতনুকে। বালিশের তলা থেকে বের করলেন একটা আংটি। দামী পাথর বসানো সোনার আংটি। মায়ের শেষ সম্বল।

অতনু জানে ওটা মায়ের বিয়ের আংটি। বাবা উপহার দিয়েছিলেন। মায়ের বড় প্রিয় জিনিষ।

অতনুর হাতে আংটিটা তুলে দিয়ে মা বলেছিলেন, 'এটা বিক্রী করলে নিশ্চয় সত্তর টাকা পাবি। যা বাবা, এটা বিক্রী করে আয়।'

সেই সময়ে অবাধ্য, দুর্বিনীত অতনুও কেমন যেন দুর্বল হয়ে যায়। মায়ের হাত চেপে ধরে বলে, এ-জিনিস আমাকে বিক্রী করতে বোলো না মা। এ আমি বিক্রী করতে পারব না। আমি বরং পরীক্ষা দেব না।'

কিন্তু মা ছাড়লেন না। মাথা কুটতে শুরু করলেন অতনুর সামনে।

বুকের পাঁজরের মত মায়ের এই আংটি। মায়ের মৃত্যুশয্যায় অতনু কি তা' নিজের জন্য বিক্রী করতে পারে? কী করবে অতনু?

অতনুকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হ'ল। ঐ আংটি বিক্রী করে ফীস জমা দিলে অতনু।

আর সেদিন-ই অতনু প্রতিজ্ঞা করলে ওকে পাশ করতে-ই হবে। ভালভাবে পাশ করতে হবে। মায়ের এই আংটির মর্যাদা রাখতেই হবে।

সেদিন থেকে-ই কি অতনু বদলে গেল?

সবাই অবাক হয়ে গেল। যে অতনুর বইয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, সে দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। মামারা বলেন, 'ভড়ং'। মামীরা মন্তব্য করেন, 'কাজ না-করার ফন্দী।'

অতনু কি এ-কথায় রাগ করে?

অতনু বদলে গেছে। এতটুকু রাগ করে না অতনু। একটাই প্রতিজ্ঞা—একটাই লক্ষ্য। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে-ই হবে। মায়ের আংটির মর্যাদা দিতেই হবে। মায়ের মুখে হাসি ফোটাতেই হবে।

সেদিনের অতনুকে দেখে সবাই অবাক হয়েছিল। একি সেই অতনু? না-কি অন্য কেউ?

মানুষের কি এত পরিবর্তন হয়?

রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আবার অতনু এসে দাঁড়াল মায়ের ছবিটার সামনে।

অতনুর চোখে জল। স্মৃতির শিশির যেন!

বারবার মনে পড়ে পুরোন কথা। 'মা, মাগো, তুমি কত ভাল ছিলে! তেমন আর কেউ হয় না কেন? কত কষ্ট দিয়েছি তোমাকে।'

অতনুর জন্মদিন হল ফাল্গুনী পূর্ণিমা—দোল। এক বছর আগের জন্মদিনটা মনে পড়ে গেল।

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করেছিল অতনু। একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ঢিল ছুঁড়ে। তারা বড়মামার কাছে নালিশ করে গেছে। মামার কাছে মার খেয়ে অতনু বিছানায় শুয়েছিল। খেতে যায় নি—কেউ ডাকতেও আসে নি। রাত্রের সব কাজ সেরে মা যখন ঘরে এলেন অতনু তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। গালের ওপর জল। অতনু অবাক হয়ে চেয়ে দেখে ওর মাথা বুকে চেপে ধরেছেন মা। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরছে।

এত বিচ্ছু অতনু! তবু মায়ের চোখের জল দেখতে পারে না। বুকটা হু-হু করে!

—'কী হয়েছে মা? তুমি কাঁদছ কেন?'

—'হ্যাঁ বাবা, তুই কি একটু শান্তি দিবি না আমাকে। একটু ভাল হবি না তুই? চিরকাল দুষ্টুমি করে বেড়াবি? তুই ভাল না-হলে আমি যে মরে-ও শান্তি পাব না। মায়ের গলার স্বরে অশ্রু টলমল করে।

অবাধ্য-দুর্দান্ত-গোঁয়ার অতনু মায়ের পাশে বসে অন্য ছেলে হয়ে যায়। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুমি আমার জন্য খুব ভাবো, না মা?'

মা দুঃখের হাসি হেসে বলেন, 'ষাট্! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বাপ?' দু-হাতে ঝাকড়া মাথাটায় চুমু খেতে খেতে মা আর থাকতে পারেন না। ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলেন।—'আজ তোর জন্মদিন। একটু ভাল কিছু খাওয়া নয়—নতুন জামা নয়। কিছুই দিতে পারলাম না তোকে এমনি হতভাগিনী মা আমি। শুধু চেয়ে চেয়ে তোর মার খাওয়া দেখলাম।'

অতনুর মনে পড়ে বাবা বেঁচে থাকতে ওর জন্মদিনে মা পায়েস রাঁধতেন—বাবা একখানা নতুন জামা আর কিছু খেলার জিনিষ এনে দিতেন।

সে কথা মনে করে মা কাঁদছেন। অতনুরও কি কান্না পাচ্ছে না? পাচ্ছে। কিন্তু সে কান্না নতুন জামার জন্য নয়। মায়ের কান্না দেখে ওরও যেন কান্না পাচ্ছে।

কিন্তু অতনু কাঁদে না। মায়ের দুঃখ ও বোঝে। তাই চুপ করে থাকে।

এক সময় মা উঠে যান। পাঁচটা টাকা হাতে করে নিয়ে আসেন। অতনুর হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে বলেন, 'কালকে বন্ধুদের নিয়ে মিষ্টি খাস। যার সঙ্গে মারামারি করেছিস তাকে-ও নিয়ে যাস।'

মামার পকেট থেকে কিংবা বাজারের টাকা থেকে পয়সা চুরি করবার জন্য অনেকবার মামাদের কাছে মার খেয়েছে অতনু। কিন্তু এই আস্ত পাঁচ টাকার নোটটা হাতের মুঠোয় পেয়েও অতনু তা নিতে পারলে না।

মাকে পনের টাকা করে হাত খরচা দেয় বড়মামা। কে জানে সত্যিই হাত খরচ কি-না। খাওয়া-পরার ঝিকেও তো মাস গেলে বেতন দিতে হয়।

অতনু মাথা নেড়ে বলে, 'টাকা থাক মা। তুমি শুধু আশীর্বাদ করো মা, সত্যিই যেন ভাল হতে পারি আমি। আমার জন্য তোমার বড় কষ্ট।'

এই কি সেই অতনু? শয়তানের চূড়ামণি—বাড়ী-স্কুল-পাড়া সব জায়গায় যে শধু দুষ্টুমির জন্য চিহ্নিত।

—'না বাবা, তুমি আর কষ্ট কই দাও? এমন পোড়া-কপাল আমার একটু ভাল খেতে পরতে—'

অতনু যেন পাঁচ বছরের শিশুটি হয়ে যায়। মায়ের মুখ চেপে ধরে ও। যেমন ধরত ছেলেবেলায়।—ভাল খেতে পরতে আমি চাই না মা। তুমি শুধু আমায় ভালবেসো। সবাই গালমন্দ করে—মারে। শুধু তুমি আমাকে ভালবেসো। তাই তো তোমার কাছে আমি লক্ষ্মীছেলে।'

মাঝে মাঝে মায়ের মনে হয় অতনুকে শাসন করবেন। কিন্তু পারেন না। ছ-বছর বয়স থেকে ছেলেটা পিতৃহীন। বাবাকে হয়ত ওর মনেই পড়ে না। আর স্বামী তো তার হাতেই সঁপে দিয়ে গেছেন তার আদরের ছেলেকে—একমাত্র সন্তানকে। পিতৃহীন ছেলেকে কি বকতে—মারতে পারেন তিনি। বকতে গিয়েও ওকে বকতে পারেন না মা। চোখ জলে ভেসে যায়। শুধু স্বামীর ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেনঃ তুমি ওকে ভাল কোরো। আমি বড় দুঃখী। আমাকে পথ দেখাবার কেউ নেই আমি কাকে পথ দেখাব। তুমিই ওই পাগলটাকে পথ দেখাও।

চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যায়। শুধু ঝাপসা হয় না স্মৃতি। আরো উজ্জ্বল হয়—আরো কত কিছু মনে পড়ে। হীরের কুঁচির মত জ্বলজ্বল করে স্মৃতির কণা।

পুরোন কাপড়ের পাড় দিয়ে অতনুর জন্য কত আসন সেলাই করেছেন মা। সুন্দর সুন্দর আসন নক্সা তোলা কাঁথা আরো কত কী। দুঃখিনী—গরীব মা। কিছুই দিতে পারেন না ছেলেকে।

যে জিনিষগুলো সবাই ফেলে দেয়, সেগুলো তুলে এনে ছেলের জন্য এটা সেটা বানিয়ে দেবার প্রয়াস।

আজ এই রাত্রি একটার সময় অতনু তার টিনের বাক্সটা খুলে ছোট ছোট জিনিষগুলো নাড়ছে আর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে।

একবার জ্বর হয়েছিল অতনুর। সারাদিন কাজ করে অতনুর পাশে এসে বসবার সময় থাকত না মায়ের। তাই সারারাত মাথার কাছে জেগে বসে থাকতেন। বসে বসে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন—চুলে বিলি কাটতেন। আর মায়ের হাতের সেই ঠাণ্ডা নরম স্পর্শে অতনুর জ্বর যেন কমে যেত। তবু অতনু বলত, 'তুমি একটু শোও মা।'

—'যাব বাবা। তুমি আগে ঘুমোও।'

মায়ের হাতের নরম নরম স্পর্শে অতনু ঘুমিয়ে পড়ত। আবার যখন জেগে উঠত, দেখত তেমনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মা। তেমনি বিলি কাটছেন চুলে।

আঃ! কী আরাম! কী ঠাণ্ডা! মা কাছে থাকলে কি ডাক্তার দরকার হয়?

হয় না। ডাক্তার ছাড়াই সেবার সেরে উঠেছিল অতনু।

কিন্তু মায়ের সেই শিয়রে বসে রাতজাগা মূর্তিটা কেন মনে পড়ছে আজ?

কেন মনে পড়ছে মায়ের মুখে শোনা সেই গল্প-গুলো?

কত গল্পই না মা শোনাতেন অতনুকে। বন্দিনী রাজকন্যে শঙ্খমালার গল্প—সোনার পাহাড়ের দৈত্যের গল্প—অচিন দেশের রাজপুত্রের গল্প। কত সুন্দর সুন্দর গল্প মায়ের জানা ছিল। আজ এই নিঃস্তব্ধ রাতে অতনুর খুব ইচ্ছে হল ও আবার ছোট হয়ে যাক। মা আবার ফিরে এসে ওকে গল্প শোনান। অতনু প্রতিজ্ঞা করছে ও ভাল হয়ে যাবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না—মারামারি করবে না। মা ফিরে আসুন। আর তাকে কষ্ট দেবে না অতনু।

না। পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর। মা আর আসবে না। মা এখন অন্য এক জগতের বাসিন্দা। মা চলে গেছেন বহু দূরের এক দেশে। পৃথিবীর মত সেখানে দুঃখ নেই—কষ্ট নেই—হিংসা নেই—দ্বেষ নেই—ঈর্ষা নেই। সেখানে সব ভাল—সব সুন্দর। মা সেই চির-সুন্দরের দেশে চলে গেছেন। কিন্তু অতনুকে বড় একা করে দিয়ে গেছেন। অতনু এখন ভাল হয়েছে—শান্ত হয়েছে—অতনুর পাগলামো কমে গেছে। কিন্তু মা তা' জানবেন না।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে অতনু। আকাশ-ভর্তি তারা। অসংখ্য তারার চুমকি জ্বলে উঠেছে। অরুন্ধতি—স্বাতী—বিশাখা। ওদের-ই মধ্যে রয়েছে মা। অপার স্নেহের আধার মা।

অনেক দূরে চলে গেলেও মায়ের অতন্দ্র দৃষ্টি রয়েছে অতনুর ওপরে। অতনুর ভাল-মন্দ অনেক দূর থেকে মা দেখছেন। সেই অপার শান্তির জগতে ওর জন্য মাকে যাতে অশান্তি পেতে না হয়, সেজন্য অতনুকে আরো ভাল হতে হবে। অতনু ভাবতে লাগল। আর, ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাকেই স্বপ্ন দেখলে অতনু।

দেখতে পেলে আবার যেন মা ফিরে এসেছেন। সেই সাদা শাড়ী পরা—চোখে-মুখে মমতার ছায়া—অখণ্ড করুণার প্রতিমূর্তি অতনুর মা। সেই আগের মত অতনুকে খেতে দিচ্ছেন—বই গুছিয়ে দিচ্ছেন—রাত্রিবেলা শুয়ে পড়লে অতনুর কপালে—মাথায়—চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'তুই থাকতে আমার দুঃখ কী বাবা? তুই বড় হবি—ভাল হবি। বড় হয়ে দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দূর করবি।'

ঘুমের মধ্যেই মায়ের শেষ কথাগুলো অতনু আবার যেন শুনতে পেল। মা বলছেন, 'বড় হয়ে তুই ডাক্তার হোস বাবা। গরীব-দুঃখীদের বিনিপয়সায় চিকিৎসা করিস। ওদের দেখবার কেউ নেই—তুই ওদের দেখিস অনু। গরীবদের বড় কষ্ট।'—তারপর মা মিলিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন অতনু জানে না।

ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। জানালা দিয়ে সোনালী সোনালী রোদ এসে পড়েছে ওর ঘরে—পড়ার টেবিলে—মেঝেতে—বিছানায়। অতনু লাফ দিয়ে উঠে মায়ের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।—'আমি ডাক্তার হব মা। তুমি দেখে নিও। নিশ্চয় হব।'

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—ভাষারাম

নরেন—আমি বাজি রেখে বলছি রমেন, তুমি যদি এমন একটা লোকের কথা বলতে পার—যে জীবনে কখনো একটিও মিথ্যে কথা বলেনি, তাহলে তোমাকে পাঁচ টাকার মিষ্টি খাওয়াব।

রমেন—ঠিক আছে। মিষ্টিটা আগে খাইয়ে দাও। গতকাল আমার একটি ভাই হয়েছে, সে জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলেনি।

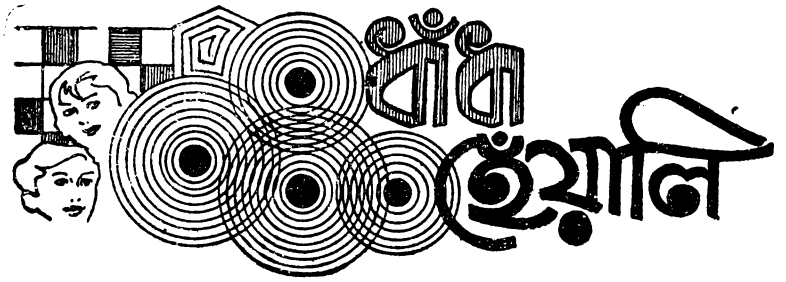

পরিচালক ঃ
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শব্দ-ছক

এবার কিশোর ভারতীর প্রিয় বন্ধুদের নতুন ধরনের একটি মজার উপহার দিচ্ছি—বিচিত্র শব্দ-ছক। বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ এই উপহারটি তৈরি করেছে কিশোর ভারতীর পাঠিকা-বন্ধুদ্বয় **রুণু ভট্টাচার্য ও তার বোন চানু ভট্টাচার্য, কাঁচড়াপাড়া।**

নিচে ষোলটি বাক্য দেওয়া আছে। এই বাক্যগুলির মধ্যে বর্তমান সংখ্যার শেষে প্রদত্ত ছকের উল্লিখিত প্রত্যেক জোড়া শব্দই ক্রমানুসারে মোটা হরফে অবস্থান করছে। বাক্যগুলির প্রত্যেক জোড়া শব্দের একটিকে অপরটির বিকল্প হিসাবে দেখানো আছে। কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত কয়েকজন লেখকের রচনা থেকে এই বাক্যগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁরা যে শব্দ-গুলি ব্যবহার করেছেন, কেবলমাত্র সেই শব্দগুলিই এই বাক্যগুলির ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং এই বাক্যগুলির জোড়া শব্দগুলির মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করতে হবে। এবং বর্তমান সংখ্যার শেষে প্রদত্ত ছকে উপযুক্ত শব্দগুলির ঠিক উপরে √ চিহ্ন দিতে হবে এবং অনুপযুক্ত শব্দগুলি দাগ দিয়ে কেটে দিতে হবে।

এইভাবে ছকটি যথাযথ পূরণ করে আগামী ২৮শে জুন, ১৯৭৩ তারিখের মধ্যে ঐটি আমাদের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেবে। এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, উত্তরদাতাদের নাম তিনজনের বেশী পাঠানো যাবে না।

১। সব মানুষই দেখছি **নির্বিরোধী/ভাল** মানুষ হতে চায়, হতে পারে না বলে একটা বেদনাবোধ থাকে মনে।

২। দেশদ্রোহিতা ও নিমকহারামির মত সাংঘা-তিক **অপবাদ/অপরাধ** বন্ধ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন কিছু করতে হয় যা না করলেই ভাল হয়।

৩। বিপ্লব **ভয়হীন/বিনাশহীন।**

৪। আমাদের সকলেরই কাছের জিনিষ অপেক্ষা দূরের জিনিষ বেশী **লোভনীয়/সুন্দর মনে হয়।**

৫। আকাশের নীলের মধ্যে সাদা মেঘের কিছুটা **থাকলেই/আঁকলেই** একখানা ছবি হয়ে গেল।

৬। **সন্তান/শিশু** হল ভগবানের দান, সে আবার নিজের আর পরের কি?

৭। দিনে দিনে গরম বাড়ছে, ঘাসের **ডগা/ডাঁটা** রঙ পালটে হলদে থেকে হলদে-সবুজে পরিণত হচ্ছে।

৮। লক্ষ্য করে দেখি দুটো ক্যকই পালা করে তা' দেয়। একটা কাছাকাছি খাদ্য সংগ্রহ করে **নিয়ে/খেয়ে** আসে, তখন অন্যটা তা' দেয়।

৯। আঁধারের **খাপে/খামে** ঢাকা স্মৃতিগুলো সব একে একে মুছে যাবে বিস্মৃতির তলে।

১০। মানুষ কি **গরু/ঘোড়া** না পাখী যে গুচ্ছের ছোলা খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হবে?

১১। আদর্শ গাইড বিপদের মুহূর্তে প্রথমে বাঁচাতে চায় তার **সহকারীদের/সহযাত্রীদের,** নিজের কথা না ভেবেই।

১২। মনগড়া একটা কল্পনা **দিয়ে/ক'রে** আঁকলে চলে, তবে বড় আর্টিষ্ট হতে হলে একটা পরিবেশ দেখে আঁকতে হবে।

১৩। কি চমৎকার **বৈচিত্র্য/বৈপরীত্য!** একই পাড়ার একপ্রান্তে চলেছে উৎসবের কলরব, আর অন্য-প্রান্তে ক্ষুধাতুর মানুষের হাহাকার।

১৪। কোন কিছুতে আগুনের স্পর্শ দিলে, তাতে আর ভূত-পেত্নীর **লোভ/রুচি** থাকে না।

১৫। ভালবাসা দিয়েই যদি বিশ্বাস করাতে না পারলাম, বাজে একটা **দিব্যি/দাগ** দিয়ে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করতে যাবো?

১৬। এতো খুনোখুনি ও বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে দিয়ে যে ভাগাভাগি রক্ষা করার চেষ্টা, **মৃত্যু/রক্ত** তাকে একসঙ্গে একত্র করে দিয়েছে।

গত এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

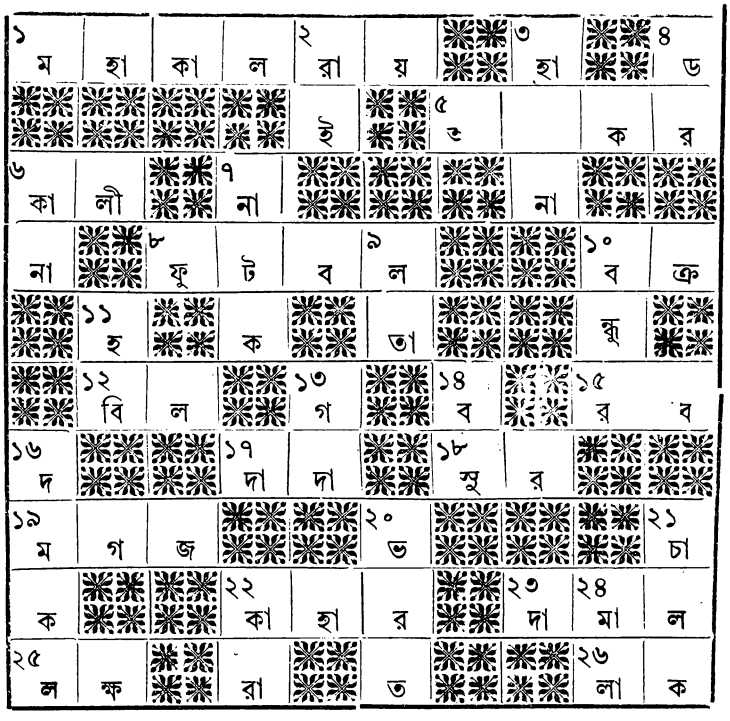

চন্দন ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১২; শান্তনু ভট্টাচার্য, কলিকাতা ৩; তাপস, শৈবাল ও প্রবাল পাল, কলিকাতা ৫০; কিশোর কুমার বিশ্বাস, কলিকাতা ৩৪; কুমকুম ও তার মা, কলিকাতা ৩২; রেবেকা, মহারাজ ও সুচেতা মুখার্জী, উত্তরপাড়া; বলাকা খাসনবিশ ও গৌতম ভট্টাচার্য, কলিকাতা ২; শ্রীমন্ত মুখার্জী, তার দাদামণি ও বৌদি, কলিকাতা ৩৩; গীতা, শান্তা ও নারু বিশ্বাস, কলিকাতা ১১; অনুতোষ ব্রহ্ম, অরূপ সাহা ও পার্থ সেন, কলিকাতা ৩৭; গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, তার ভাই ও বাবা, কলিকাতা ৬০; রত্না, পিনাক ও নিবেদিতা মারিক, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ; চম্পা, পম্পা ও বাপী গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৫; নীলিমা, মাধুরী ও দেবাশীষ প্রধান, রামপুরহাট; বুড়ো, পম্পা ও শান্তি, কলিকাতা ২; ভারতী বসু, কলিকাতা ২; ভোলানাথ, তার মা ও জ্যাঠামশাই ঝুলনতলা; এলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫০; সন্ধ্যা ও সুবল মিদ্যা, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ; খড়্‌ম্বা বাণী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, খড়্‌ম্বা; সবিতা ও গৌতম সরকার, কলিকাতা ৫০; জঙ্গল, মুখার্জী, দুরন্ত ও নন্টে মৌলিক, কলিকাতা ১০; মানস, অঞ্জন ও বাপী চক্রবর্তী, কলিকাতা ৪১; অর্চনা মুখোপাধ্যায়, উদয়রাজপুর; বিশ্বজিৎ ও চিরশ্রী ব্যানার্জী, মাঝেরপাড়া; রঞ্জন, শুভাশীষ সেন ও তার বাবা, কলিকাতা ১৪; পিন্টু, চৈতালী ও তাদের মেজদা, কলিকাতা ৫৬; দীপান্বিতা, সুস্মিতা ও সুমিতা দাস, জামসেদপুর ৩; মহুয়া চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫০; চিত্রা, অপর্ণা ও রেখা ঘোষ, নিগা কলিয়ারী; মনতোষ, টাইনি ও অরিজিৎ, দুর্গাপুর ৫; শ্যামল ও শিবু হালদার, রামপুরহাট; অনিত দে ও শান্তিময় দত্ত, কলিকাতা ২; চন্দন, বাপ্পা ও পিকু কলিকাতা ২৭; বিম্পা, পাম্পু ও তার জ্যেঠু, হাওড়া ৩; বাবু, বাচ্চু ও জিতা নন্দী, কলিকাতা ১২; মিনতি, দেব আনন্দ ও সলিল দাস, কলিকাতা ১২; অসিতবরণ সেন, বারিদবরণ সরকার ও আশীষ ঘোষ, রামপুরহাট; শর্বরী ও সর্বাণী রায়, গড়িয়া; শোভন গুপ্ত, সোদপুর; মৃণাল, শৈবাল ও প্রবাল গুপ্ত, দুর্গাপুর ৫; কুশল ও বিপ্লব ভট্টাচার্য কলিকাতা ২৬; ইন্দ্রনীল, পিপু ও টিঙ্কু চ্যাটার্জী, কলিকাতা ৪০; সব্যসাচী, প্রবীর ও অমিতাভ চৌধুরী, দুর্গাপুর ৯; রবীন্দ্রকুমার, শেফালী ও রণধার পাকড়াশী, কৃষ্ণনগর; গীতা, স্বপন ও বিকাশ, দুর্গাপুর ৫; বুবুল, ছট্টু ও ডুডুন, পুরোনো ঝাড়গ্রাম; স্বাতী ও রমা মৈত্র, শ্রীরামপুর; রূপা দাস, তার মা ও মুনামকাকু, ফালাকাটা; সুব্রতকুমার, সংযুক্তারাণী ও প্রশান্তকুমার খাঁড়া, কর্ণেলগোলা; রঞ্জু, টিটু ও বাচ্চু মুখার্জী, শেওড়াফুলী; ছবি, মানস ও কণিকা দত্ত, ডিমডিমা চা বাগান; সোমশংকর, শীলা ও কুমকুম দে দালাল, কর্ণেলগোলা।

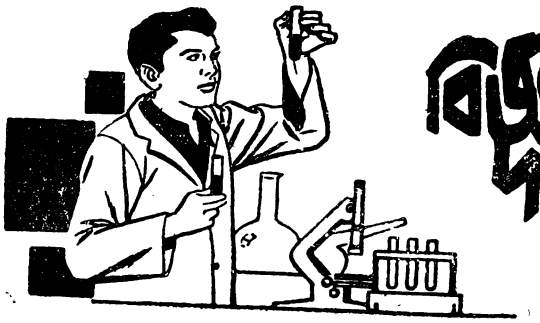

বিজ্ঞানীর দপ্তর

• পরিচালক •

কিশোর বিজ্ঞানী

নিজে করো—সুশান্ত দত্ত

॥ এক ॥

তোমরা ফুলদানিতে ফুল অনেকেই রাখ। কিন্তু বেশীদিন থাকে না। ফুলগুলো ঝরে যায়। তাই না? কিন্তু একটু সামান্য কাজ যদি কর তবে ফুল বেশীদিন স্থায়ী হবে আর নুয়ে পড়া ফুলও বেশ টাটকা হয়ে উঠবে।

কাজটা এই—এ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের গুঁড়ো (ওষধের দোকানে পাওয়া যায়) একটু নিয়ে ফুলদানির জলে মিশিয়ে দাও। দেখবে, কেমন টাটকা হয়ে ওঠে তাড়াতাড়ি।

॥ দুই ॥

তোমরা তো অনেকেই ছবি আঁক। সাদা রংকে বেশ উজ্জ্বল করতে হলে কি করতে হয় জানো?

সাদা রঙ-এর মধ্যে সামান্য একটু কালো রঙ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নাও, দেখবে আগের থেকে উজ্জ্বল হয়েছে।

॥ তিন ॥

টিনে বিস্কুট খোলা অবস্থায় রাখলে তা নরম হয়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু এই নরম হওয়া বন্ধ করা যায়। একটি টুকরো কাপড়ে কিছুটা লবণ বেঁধে তা ঐ বিস্কুটের টিনে রেখে দাও, দেখবে আর ঐ বিস্কুট নরম হবে না; বেশ টাটকা ও মচ্‌মচে থাকবে।

● বিজ্ঞান-বিচিত্রা ●

মশা মারতে মিনো

মিনো হচ্ছে এক জাতের ক্ষুদে মিঠে জলের মাছ, আমেরিকার নিউ মেক্সিকো ও তার আশেপাশের রাজ্যগুলিতে এই মাছকে জলা জায়গায়, ছোট ছোট গর্তের জলে বা নালার জলে জন্মাতে দেখা যায়। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, মশার ডিম এই মাছের সবচাইতে প্রিয় খাদ্য। এই মিনো মাছেরা যে সব জায়গায় জন্মায়, সে সব স্থান মশার ডিম পাড়বার পক্ষে উপযুক্ত। ফলে মশা এবং মিনো মাছের ডিম একই স্থানে থাকে। বর্ষার জল পাওয়ার পনেরো থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে মাছের ডিমগুলো ফোটে এবং বাচ্চাগুলো মশার ডিম খেতে শুরু করে।

বিজ্ঞানীরা এই মাছের আয়ুষ্কাল কমিয়ে এবং মাছের বংশবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে এই মাছকে মশা মারবার সর্বাধুনিক হাতিয়ার ও মশা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন।

—সিতাংশুবিমল করঞ্জাই

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবদান

ভাবলে অবাক হতে হয়, হাতের কড়ে আঙুলের সাইজের মত ছোট্ট ও লোভনীয় একটি ক্যামেরা। হ্যাঁ, এই ক্যামেরায় ফটোও তোলা হয়; তবে শরীরের ওপরের অংশের নয়—ভেতরের। মানুষের শরীরের কয়েকটি স্বাভাবিক দ্বারপথ, যেমনঃ—কান, নাক, গলা, চোখ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই মিনি-ক্যামেরাটি শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে রোগাক্রান্ত অংশের নির্ভুল ও রঙিন ফটো তুলে আনা হয়। এতে সেই বিশেষ রোগাক্রান্ত অংশটির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে যায়। রোগ নির্ণয়ের জন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান তথা চিকিৎসককে এখন আর মোটেই অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত এই অভিনব পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন "এনডোসকপি"। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি—বিশেষ করে জাপানে এই পদ্ধতিটি বর্তমানে চালু হয়েছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পৃথিবীর অন্যতম খ্যাতিমান এনডোসকপিষ্ট্

জাপানের ডাঃ হিরোসি ওসিসো বিভিন্ন রোগীর দেহের অভ্যন্তরের নির্ভুল আলোকচিত্র গ্রহণ করে উপযুক্ত চিকিৎসা চালিয়ে বিশেষ সুফল পেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে উন্নতির আর এক ধাপ ওপরে উঠতে সাহায্য করেছে; আর্ত মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন তিনি।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের নতুন উপায় ও কৌশল উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, দঃখের বিষয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই শাখার সাথে তাল মিলিয়ে ভেষজ শাখা ক্যানসারের মত ভয়াবহ রোগ নিরাময়ের উপযুক্ত ও দ্রুত কার্যকরী ঔষধ আজও উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় নি। তবে আশা করা যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনা ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হবে না; এবং অদূর ভবিষ্যতে মানুষের কঠিনতম ব্যাধিসমূহও সহজ-সরল, কম ব্যয়সাধ্য, দ্রুত ও স্থায়ী ফলপ্রদ ঔষধের কল্যাণে সারিয়ে তোলা যাবে।

বিড়ালের স্বভাব

ইঁদুরের উৎপাতে অস্থির হয়ে পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থই আদর করে বিড়াল পুষে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিড়াল কৃতজ্ঞজীব নয়। কুকুর, গরু, মহিষ, ভেড়া, উট, গাধা, হরিণ, ঘোড়া ইত্যাদি জন্তু ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণময় অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে আসছে। কিন্তু গৃহপালিত জীব হলেও, প্রকৃত পক্ষে, বিড়াল মানুষের আদৌ কোন উপকারে লাগে না। আত্মসুখপ্রিয় এই জীবটি যতদিন ভালো খাবার খেতে পাবে, ততদিন সে মালিকের পাশটিতে শুয়ে আরামে গলা থেকে এক প্রকার ঘড় ঘড় শব্দ বের করবে। এই শব্দকে অনেক গৃহস্থ বিড়ালের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। কিন্তু আসল কথা, মাছ-ভাত-দুধ-মাংস ইত্যাদি পেট পুরে খেতে পেলে বিড়াল কখনও ইঁদুর মারবে না; ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়েই সে বাধ্য হয়ে ইঁদুর মেরে খায়। কুকুর প্রভুভক্ত জীব। একবার যাকে ভালবাসে প্রাণ দিয়েও সেই ভালবাসার মর্যাদা সে রাখে। বিড়ালের স্বভাবটা এর উল্টো। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও নিতান্ত দেহসর্বস্ব কোন কোন মানুষের স্বভাবের সাথে বিড়ালের স্বভাবের আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়।

—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

হাড় ভাঙলে ভয় নেই

গাছে চড়তে গিয়ে, খেলতে গিয়ে অথবা মারামারি করে অনেক সময় তোমরা হাত-পা ভেঙ্গে বস। তার পরেই 'মরে গেলাম' বলে চেঁচিয়ে মা-বাবাকে জ্বালাতন কর। তারপর তোমাকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পাড়ার প্রতিবেশীরা ব্যস্ত হয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান ডাক্তারবাবু 'এক্স-রে' করে হাড় ঠিকমতো জোড়া লাগিয়ে দেন। আবার তোমরা মনের আনন্দে খেলা করতে পার।

অনেক সময় খুব বেশী রকমভাবে বা বিপজ্জনকভাবে ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া লাগে না। তখন ডাক্তারবাবুরা ভীষণ বিপদে পড়েন। চিন্তা করে কুল-কিনারা পান না। বড় বড় পুঁথি ঘেটেও তার হদিস মেলে না। কিন্তু এবার থেকে ডাক্তারবাবুদের আর বিব্রত বোধ করতে হবে না। আর তোমাদেরও হবে মজা। খুব বিপজ্জনকভাবে হাড় ভাঙ্গলে আবার তা' জোড়া লেগে যাবে। সুতরাং দুষ্টুমি করার আরো বড় সুযোগ পেলে তোমরা।

কি ভাবে—জান?

আমেরিকার পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শল্য-চিকিৎসক সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, বিদ্যুতের সাহায্যে বেয়াড়াভাবে ভাঙ্গা হাড় আবার জোড়া লাগানো সম্ভব হবে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-চিকিৎসক ডাঃ কার্ল টি. ব্রাইটন প্রায় নয় বৎসর বিভিন্ন পশুপক্ষীর উপর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হাড়ের সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য ১০ থেকে ২০ এ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রয়োজন। সুতরাং বেয়াড়াভাবে ভাঙ্গা হাড়গুলোকে ঠিকভাবে অথবা মুখোমুখি বসিয়ে যদি ঐ পরিমাণ বিদ্যুৎ তরঙ্গ সঞ্চালন করা যায়, তবে অবশ্যই হাড় জোড়া লাগবে। কিন্তু কম হলে হবে না, আবার বেশী হলে হাড় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

যদি হাড় গুড়ো হয়ে যায় তবে, হাড় এনে বসিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলে হাড় জোড়া লাগবে। সেটিং-এর নিয়ম হলো গাছের কলম বাঁধার মতো।

কেমন করে হাড় জোড়া লাগায়?

ভাঙ্গা জায়গা অসাড় করার পর ঐ জায়গাটি অস্ত্রোপচার করে; তারপর বৈদ্যুতিক তার এবং ব্যাটারী সংযোগে হাড় জোড়া লাগানো হয়।

বিপজ্জনকভাবে হাড় ভাঙ্গলে সারতে সময় লাগে দুই-তিন মাস মাত্র।

—সমরেন্দ্র মণ্ডল

কোন্ নূপুরে ?

সুরান্বেষী

॥ দুই ॥

আচ্ছা, রাগ-রাগিনীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, কিন্তু এগুলোর সৃষ্টি হল কি করে বল তো?

ভারতীয় সংগীতে প্রধান রাগ-রাগিনীগুলির সৃষ্টিকথা জড়িয়ে আছে পৌরাণিক কাহিনীর সাথে।

শোনা যায় মহাদেব আর পার্বতীর মুখ থেকেই প্রথম রাগের সৃষ্টি হয়। এ-ধরনের কাহিনী শুধু যে ভারতবর্ষেই পাওয়া যায় তাই নয়, অন্যান্য দেশেও এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে।

জাপানের একটি পৌরাণিক কাহিনী তোমাদের বলি।

সূর্যের পত্নী অমতারসু অন্যান্য দেবতাদের কাছে একবার অপমানিত হয়ে একটি নির্জন পর্বতগুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। শেষে দেবতারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অমতারসু অস্বীকার করলেন। তখন দেবতারা চিন্তায় পড়লেন। শেষে ঠিক করলেন, সংগীত সৃষ্টি করে তাঁকে মুগ্ধ করতে হবে এবং হ'লও তাই। অপূর্ব সংগীত শুনে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন অমতারসু।

এই কাহিনী থেকে এটুকু বোঝা যায়, জাপানী সংগীতেও ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তা জড়িয়ে ছিলো। জাপানে কিন্তু সংগীতের উপাদান ও প্রেরণা পেয়েছিলো চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে; আর এর উৎস ছিলো ভারতবর্ষ।

আবার দেখো, বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি নিয়ে যে-সব প্রাচীন গল্প পাওয়া যায়, তাতেও কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

চ্যাপেল বলে এক সাহেব তাঁর সংগীতের ইতিহাসে বলেছেন—হার্মিসের গাথায় বর্ণনা আছে ঃ হোমর কিল্লেনি পর্বতের ওপর তাঁর গুহার পাশে একটি প্রকাণ্ড কচ্ছপ দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ কচ্ছপটিকে মেরে তার খোলাটি সংগ্রহ করলেন এবং তাতে গোরুর চামড়া ও ভেড়ার অন্ত্রে তৈরি সাতটি পর্দা (তাঁত) দিয়ে এক বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করলেন। তারপর সেটি একটা কোণ-এর সাহায্যে তিনি বাজাতে লাগলেন। অনেকে বলেন, হোমর কচ্ছপের খোলাটি পেয়েছিলেন নীল নদের তীরে।

আমাদের সংগীত-শাস্ত্রেও এমন একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে।

চারিদিকে নিথর নিবিড় বন। সরোবরে স্নান করছেন নারদমুনি। এমন সময় বৃষ্টির ধারা নামলো। টুপ্ টাপ্ শব্দে সরোবরের বুকে সাড়া জাগলো। এই শব্দে আত্মহারা হলেন মুনিবর। তিনি এই সুরময় শব্দকে ধরে রাখবার প্রেরণা পেলেন। সৃষ্টি হল মৃদঙ্গের।

আর্ট বলে—আত্মার কম্পন থেকেই সুরের উৎপত্তি। মুনি আনন্দে কেঁপে উঠলেন, তাই সংগীতও মুক্তি পেয়েছিলো মৃদঙ্গের বোলে। এ যেন অন্ধকারে-ফুটে-ওঠা আলো, বোবা শিশুর মুখের প্রথম কথাকলি।

লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই যে, পাশ্চাত্য দেশের ঐ গল্পে আত্মার এই কাঁপনটুকু ছিলো না। এখানেই পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে আমাদের তফাৎ।

আচ্ছা, এই সময়ে একটা প্রশ্ন মনে জাগে স্বাভাবিক-ভাবেই—গান আগে, না বাজনা আগে এসেছিল? এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে বিস্তর, তবু অনেক পণ্ডিতের মতে গানই আগে এসেছিল বলে জানা যায়।

"The rise of music in ancient world"

বলে একটি গ্রন্থে উল্লেখ আছে—Music began with singing. অর্থাৎ সংগীতের জন্ম গান দিয়েই শুরু। আর আমরা যদি বলি, একই সঙ্গে? তাহলেও বোধহয় খুব ভুল হবে না; কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা গান, বাজনা আর নাচের উল্লেখ একই সঙ্গে পেয়েছি। যজ্ঞের সময় বিচিত্র ছন্দে স্তব পাঠ করা হত আর তাতে থাকতো ছন্দ, তাল আর সুর।

মনের চোখটাকে একটুখানি মেলে দাও তো দূরে, অনেক দূরে—আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে! চেয়ে দেখ, এক নিবিড় অরণ্য, তাতে বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল পাহাড় পর্বত। বয়ে চলেছে আঁকা বাঁকা নদী—দুই তীরে গাছ, গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে পাখি; আর বনের মাঝখানে জ্বলছে আগুন, ফলমূল, ধূপ ধুনো, আর ঘৃতাহুতিতে আশ্চর্য এক সুগন্ধে সমস্তটা বনকে যেন করেছে মাতোয়ারা। ঋষিরা স্তোত্র পাঠ করছেন উদাত্তকণ্ঠে। এর আগেই বলেছি সামবেদই ভারতবর্ষের প্রথম সংগীত অধ্যায় আর এই বেদের মন্ত্রধ্বনিই যেন পৃথিবীর সারাটা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকাণ্ড এক শান্ত সরোবরে ছোট একটা ঢিল ছুঁড়লে যেমন জলের বুকে ছোট্ট বৃত্ত উঠতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড বলয়ের মতো সারাটা সরোবরে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আমাদের ভারতীয় সংগীতের সুরই ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে। প্রভাবিত করলো সারা পৃথিবীর মানুষকে।

শুধু চীন জাপান কেন, সকলেই স্বীকার করেন একথা। এমনকি প্রাচীন গ্রীকসভ্যতা থেকে সারা ইউরোপে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করলো। ইতিহাস বলে—ভারতবর্ষে যখন সঙ্গীতের উৎকর্ষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে, গ্রীসে তখনও সংগীতচর্চা মোটেই অগ্রসর হয়নি। অবশ্য প্রাচীনত্বের দিক থেকে গ্রীসের খ্যাতি আছে। কেউ কেউ বলেন—প্রাচীন গ্রীকরা ভারতের সংগীত শাস্ত্র দেখেই তাঁদের দেশে সংগীত-বিদ্যার প্রসার ও উন্নতি সাধন করলেন। পারস্য ও আরব দেশও হিন্দু সংগীতের পুঁথিপত্রাদি থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছিলো এবং সংগীতের মান উন্নয়ন করেছিলো।

আবার আমরা ফিরে আসি রাগ-রাগিনীর কথায়। আমাদের দেশে কিন্তু রাগরাগিনীর দেবমূর্তি কল্পনা করার রেওয়াজ আছে। তাঁদের ভক্তরা যদি ঠিক ঠিক স্মরণ করেন, তাহলে দেবতারা গায়ক গায়িকার রাগ-আলাপে নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করেন। এই ধ্যানমূর্তি নিয়ে সংস্কৃত শ্লোকে সব নিখুঁত বর্ণনা আছে, এমন কি সেই অনুসারে অপূর্ব সব ছবি পর্যন্ত আঁকা আছে।

আবার দেখো, দেবতাদের যখন তখন ডাকলে তো চলে না, তাঁদের অবকাশ মতো ডাকা চাই, তাই বিশেষ বিশেষ রাগ গাইবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। যেমন ধরো, সকালে ভৈরব, দুপুরে সারঙ্গ, বিকেলে মূলতান, রাত্তিরে বেহাগ—এমনি কতো! এ-সম্পর্কে আধুনিক ব্যাখ্যাও আছে। যেমন, সেকালে রাজবাড়িতে প্রহরে প্রহরে বৈতালিকদের গান হত, তাই একঘেয়ে বা এলো-মেলোভাবে না গেয়ে তারা বিশেষ সময়ের জন্যে রাগ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

সংগীত সম্বন্ধে তোমরা আরো মজার মজার কথা শুনেছো হয় তো, এও শুনেছো, বিশেষ বিশেষ রাগের সব অসামান্য ক্ষমতা আছে—যেমন দীপক গাইলে আগুন জ্বলে, মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি নামে। এগুলো একটু অতিরঞ্জিত হলেও কিছুটা তাৎপর্য আছেই জানবে। আর এর একটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। ছয় ঋতুর সঙ্গে ছয় রাগের একটা সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। ছয় ঋতু ভারত-বর্ষে চিরকালই সাহিত্যে, কাব্যে সম্মান পেয়েছে। জানো তো মহাকবি কালিদাস একটি কাব্যগ্রন্থই লিখেছিলেন যার নাম 'ঋতু-সংহার'। সংগীতেও নিঃসন্দেহে এই ছয় ঋতুর প্রভাব ও প্রাধান্য আছে। গ্রীষ্মের 'দারুণ অগ্নিবাণে' দীপক গাইলে আগুন জ্বলাটাই স্বাভাবিক আর বর্ষার মেঘলা দিনে 'মেঘমল্লার' গাইলে, বৃষ্টি নামাই শোভন। নয় কি? অবশ্য এগুলো গায়কদের প্রতিভার অলৌকিক ক্ষমতা-বর্ণনার জন্যেই ব্যবহৃত হত। মিঞা তানসেন, সাধক ত্যাগরাজের জীবনে তাঁদের সংগীত প্রতিভার সব অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। সেসব নিশ্চয়ই তোমাদের পরে শোনাবো।

রাগরাগিনীর আর একটি আধুনিক ব্যাখ্যাও আছে, সেটাও বিশেষ করে গ্রহণযোগ্য। এক-একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ সুর থেকেই বিভিন্ন রাগরাগিনীর উৎপত্তি হয়েছে। কথাটা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় কারণ অনেক রাগরাগিনীর নাম দেশের নামের সঙ্গে মিলে যায়, যেমন—সিন্ধু, গুর্জরী, মূলতান, সুরট ইত্যাদি।

একটা কথা বলা হয়নি, ছয়টি রাগের কিন্তু ছয়টি করে সঙ্গিনী আছে আর তাদেরই নাম রাগিনী। তাহলে কতগুলো রাগিনী হল? কেন ছয় ছক-ছত্রিশ!

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে—রাগ কাকে বলে? মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে, প্রকাশ করে বলতে হয়তো একটু অসুবিধে হতেও পারে, আর সেটা তো স্বাভাবিক; ধরো না কেউ যদি তোমাদের বলে—বাতাস কি জান তো? তোমরা সবাই বলবে হ্যাঁ, এ আর কে না জানে? কিন্তু পরক্ষণেই যদি কেউ প্রশ্ন করে, আচ্ছা এবারে বাতাস কাকে বলে বুঝিয়ে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই ফাঁপরে পড়ে যাবে, তাই না? তাহলে এই দাঁড়ালো—রাগরাগিনীর মোটামুটি কতগুলো শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে সুবিধের জন্যে, বোঝবার জন্যে, বৈচিত্রের জন্যে। রাগরাগিনীর কাজ হচ্ছে প্রতিটি সুরের এক একটি জাতি পরিচয় দেওয়া। মানুষেরও যেমন জাতি আছে। এক এক জাতির এক এক রকম গঠন, চলন বৈশিষ্ট্য। সব কি মিলিয়ে ফেলা যায়? তাহলে আলাদা করে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না, বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্যকে হারাতে হয়। নয় কি? এখানেই রাগরাগিনীর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা!

॥ তিন ॥

আগেই বলেছি ভারতীয় সংগীত অর্থাৎ গান, বাজনা আর নাচ এই তিনটি প্রকাশকে ঘিরে রয়েছে ভারতবাসীর ধর্মের

অভিব্যক্তি। দেব দেবী ও পৌরাণিক আখ্যান একটা মস্ত বড় অংশ জুড়ে আছে।

আর একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় কোন দেশের পৌরাণিক কাহিনীগুলো না জানলে সে দেশের সংস্কৃতির কাঠামোকে বোঝা যায়না।

পৌরাণিক কাহিনীগুলোর দুটো দিক আছে। একটা হল গল্পকথা বা কাহিনীর বৈচিত্র আর একটা হল তার তত্ত্বগত দিক বা রূপক।

সংগীতের কথা বলতে গেলেই তাই পুরাণের কথা কিছু এসে যাবেই।

বায়ুপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে সংগীতের প্রচুর তত্ত্ব পাওয়া যায় যেগুলো সংগীত জগতের সমৃদ্ধি বা গৌরব দান করেছে।

তোমরা হয়তো কিন্নর। গন্ধর্ব ও অপ্সরা এঁদের নাম শুনেছো। এঁদের কথা তোমাদের কাছে বলবো। এঁদেরকে বলতে পারো উপদেবতা অর্থাৎ ঠিক দেবতা নয়। দেবতার মতো বা কাছাকাছি। গন্ধর্বদের উৎপত্তি কথা আছে বিষ্ণু-পুরাণে। ব্রহ্মার কান্তি থেকে গন্ধর্বেরা উৎপন্ন হয়েছেন। গান করতেই এঁদের জন্ম হয়েছিল। মহাভারতের মতে এঁরা কাশ্যপের পুত্র। গন্ধর্বেরা স্বর্গের গায়ক। শুধু গান বাজনা নয়। তাঁরা নাটক অভিনয়েও পটু। অতি রূপবান তাঁরা, স্বর্গেও তাঁদের রূপের খ্যাতি সুবিদিত। তাঁদের আমরা ইন্দ্রের সভায় দেখি, দেখি ব্রহ্মার সভায়। অন্যান্য দেবতাদের সভাতেও তাঁদের আমরা গান বাজনা শোনাতে দেখি। কিন্তু তাঁরা স্বর্গবাসী নন। তাঁদের বাস-স্থান গন্ধর্বলোকে। নীচে গুহ্যকলোক, উপরে বিদ্যাধর-লোক। মাঝখানের গন্ধর্বলোক থেকে তাঁরা স্বর্গে যাতায়াত করতেন।

গন্ধর্বদের মধ্যে আবার দুটো জাতি। গন্ধর্বলোকের যাঁরা পুরনো অধিবাসী তাঁদের বলে দিব্য গন্ধর্ব আর যে-মানুষেরা পুণ্যবলে গন্ধর্ব হন তাঁরা মর্ত্য-গন্ধর্ব নামে পরিচিত।

ঋগ্বেদেও আমরা দৈব গন্ধর্বের পরিচয় পাই। বৈদিক যুগে তাঁরা উঁচু শ্রেণীর উপদেবতা বলে গণ্য হতেন আর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন দেবতাদের। তাঁরা সোমরস তৈরি করতেন এবং তা রক্ষা করতেন। ওষধির ব্যবহারও জানতেন এঁরা। এছাড়া সূর্যের অশ্ব চালনা করতেন এঁরা। কিন্তু এসব গুণ কিছুই নয় তাঁদের সঙ্গীত প্রতিভার কাছে। দেবতারা তাঁদেরকে ভীষণ ভালবাসতেন তাঁদের গানবাজনার জন্যে। গন্ধর্বদের বাদ দিয়ে দেবতাদের কোনো উৎসবই চলতো না।

তুম্বুরু গন্ধর্ব বলে এক গন্ধর্বের নাম ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তুম্বুরী বীণা বা তানপুরো এঁরই সৃষ্টি। এ যন্ত্র তোমরা সবাই দেখেছো। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে এ যন্ত্রের ব্যবহার হয়। লাউ-এর বসে তৈরি অনেকটা বীণার মতো; দুটি লোহার ও দুটি পিতলের তারে সুর বাঁধা হয়।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের ইতিহাস ভারি বৈচিত্র্যময়। কোন্ যন্ত্র কেমন করে এলো। কী ভাবে প্রথম মানুষ যন্ত্র সংগীতে আকৃষ্ট হল এবং অদ্ভুত অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র তৈরি হ'ল সে সব শোনাবো বিস্তারিত ভাবে।

সংগীতের জগতে নারদের নামও বহুল পরিমাণে খ্যাত। তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর নাম শুনেছ। কী করে সঙ্গীত-জ্যোতিষ্ক নারদ গন্ধর্বের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন সে গল্প শোনাই।

ত্রেতাযুগে কৌশিক নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সারা জীবন তিনি হরিনাম গান করেছেন আর তার জন্যে দুর্দশার সীমা ছিল না। দুঃখ ভোগ শেষ হলো, যখন তিনি এলেন বিষ্ণুর সভায়। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। দেবর্ষি নারদও উপস্থিত আছেন। কৌশিক নিজেও হরিগুণ গান করলেন। তুম্বুরুও গান গাইলেন এই আসরে।

তুম্বুরুর গান শুনে দেবর্ষি নারদ মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন —এ কী অসাধারণ প্রতিভা? স্তম্ভিত হলেন তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের গোপন কোণে তাঁর ঈর্ষা জেগে উঠলো। তুম্বুরুকে কী করে জয় করা যায়—এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি চলে গেলেন বিষ্ণুর কাছে। নিবেদন করলেন তাঁর মনোবাসনা। বললেন আমি কেমন করে জয় করবো তুম্বুরুকে বলুন দেব? বিষ্ণু একটু হাসলেন মাত্র এবং বললেন—যাও উলুকেশ্বর গানবন্ধুর কাছে—তিনি তোমাকে শেখাবেন গান। পূর্ণ হবে তোমার মনোবাসনা।

গানবন্ধুর কাছে যথা নিয়মে পাঠ শুরু হলো। শিখতে শিখতে তার দশ হাজার বছর কেটে গেলো। তারপর নারদ ভাবলেন—এখন নিশ্চয়ই তুম্বুরুকে জয় করা আর কঠিন হবে না। সাধনার অহঙ্কারও তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি রওনা হলেন তুম্বুরুর বাসভবনে।

তুম্বুরুর বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি দেখতে পেলেন বেশ কয়েকজন বিকলাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ পথের ধারে পড়ে আছে আর গোঙাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন; জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে তোমাদের? কে তোমরা?

উত্তর এলো—আমরা রাগ আর রাগিণী।

নারদ বললেন ঃ তোমাদের এ দশা হয়েছে কেন? ওরা বললো—নারদ মুনির জন্যে আমাদের এই দশা। নারদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সে কী? কী বলছো তোমরা? পরিষ্কার করে বলো!

রাগ রাগিণী করুণভাবে বললো—নারদ মুনির কসরৎ আর অহমিকার ফলেই আমরা বিকলাঙ্গ হয়েছি।

নারদ মুনি তো শুনে থ। লজ্জিতও হলেন খুবই। দুঃখের সুরে বললেন—তা এখানে তোমরা কী করছো?

তারা বললো ঃ গান গেয়ে তুম্বুরু আমাদের ভাল করে দেবেন, আবার আমরা সুস্থ হবো এই আশায় এখানে এসেছি।

নারদের অহঙ্কার নিমেষে দূর হলো। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন—তাঁর সাধনায় কোথাও ত্রুটি হয়েছে, আবার শুরু করলেন সাধনা; এবার আর অহঙ্কার নয়। ঈর্ষা নয়, কসরৎ নয়, সত্যিকারের সাধনায় মগ্ন হলেন তিনি।

॥ চার ॥

ভারতের মার্গ সংগীতের যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই তার জন্যে অনেকটা কৃতিত্ব পেতে পারেন মুসলমান আমলে সুলতান বাদশাহরা। তাঁদের উৎসাহ ও পোষকতায় ভারতীয় সংগীত যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো? ইসলাম ধর্মে সংগীত চর্চা ও চিত্রকলার অনুশীলন একরকম নিষিদ্ধ বলা চলে। তা সত্ত্বেও মুসলমান আমলে এ ধরনের বিকাশ বিস্ময় জাগায় না কি? আমীর খসরু বিদেশী হলেও ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির গুণগ্রাহী ছিলেন। বহু বিদেশী ও পারসিক রাগ-রাগিণীকে তিনি ভারতীয় রূপ দিয়েছেন। তিনি ভারতের প্রাচীন লোকসংগীতকে অদল-বদল করে ত্রয়োদশ শতকে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গানের প্রবর্তন করেন। এদেশে সেতারের প্রবর্তনও নাকি তাঁর। ধ্রুপদ সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত আইন-ই আকবরী গ্রন্থে বলেছেন যে গোয়ালিয়র প্রদেশে যে লোকসংগীত প্রচলিত ছিল রাজা মানসিংহ তোমরের তা খুব ভাল লাগতো; কিন্তু পণ্ডিতেরা অবজ্ঞা করতেন। শেষকালটায় গুণী নায়ক বখশু ও অন্যান্য ওস্তাদের সহযোগিতায় এই সংগীতকে উন্নত করে ধ্রুপদে রূপ দেন। পরে বখশু কলিঞ্জরের রাজা কীর্তি সিংহের দরবারে এবং গুজরাটের সুলতানের দরবারে থেকে ধ্রুপদ গানের প্রচার করতে থাকেন।

এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো আকবর বাদশাহ্‌র দরবারে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী ছিলেন মিঞা তানসেন। তানসেন আগে ছিলেন হিন্দু (বাংলাদেশের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে)। পরে অবশ্য তিনি মুসলমান গুরুর শিষ্যত্ব এবং বিবাহসূত্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

মিঞা মল্লার বলে যে রাগটির নাম তোমরা শুনেছো তা এই মিঞা তানসেনেরই সৃষ্ট রাগ।

মোগল বাদশাহ-র যুগকে অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীকে ভারতীয় মার্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা চলে। হিন্দু ও মুসলমান কলাবিদরা এই সময় বিচিত্র রাগ-রাগিণীকে অবলম্বন করে মার্গ-সংগীতের ইমারত গড়ে তুলেছিলেন। তানসেন ছাড়া এমন কয়েকজন সাধকের নাম করবো যাঁরা ভারতীয় সংগীত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁরা হলেন—বৈজু বাওরা। গোপাল নায়ক। স্বামী হরিদাস, সদারঙ্গ, বিলাস খাঁ, গুলাব খাঁ, মজিদ খাঁ। এ-ছাড়া কর্ণাটিক সংগীতের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম করবো। তিনি হলেন সাধক ত্যাগরাজ।

পরবর্তীকালে কিন্তু বাদশাহদের দুর্দিনে সংগীতেও পড়লো ভাটার টান। এইসব সাধক বংশের কেউ বা গেলেন রাজপুতানায় হিন্দুরাজাদের আশ্রয়ে, কেউ বা যান কাশী-রাজের আশ্রয়ে। উদয়পুর ধ্রুপদীদের এবং গোয়ালিয়র ও বেওয়া খেয়াল গায়কদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো। কাশীতে গেলেন রবাবীরা অর্থাৎ রবার বাজাতেন যাঁরা, জয়পুর গেলেন সেতারীরা। আর রামপুর নবাবের আশ্রয়ে যান বীণকারেরা। কাশী, অযোধ্যা, গয়া, বেতিয়া ও বাংলা-দেশের বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গায়করা ছড়িয়ে পড়লেন। পূর্ব ভারতের দিকে যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন, 'পুরবিয়া' আর যাঁরা রাজপুতানা রায়পুর গোয়ালিয়রে যান তাঁদের বলে 'পশ্চিমা।'

আগেই বলেছি ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। বিখ্যাত হিন্দু সংগীতশাস্ত্রগুলির রচনা কাল থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। ঐসব সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, নারদের সংগীত মকরন্দ শাঙ্গদেবের সংগীত রত্নাকর, সোমনাথের রাগবিরোধ, দামোদরের সংগীত-দর্পণ, লোচন পণ্ডিতের রাগরাগিণী এবং অহোবলের সংগীত পারিজাত আজো পণ্ডিতেরা এবং শাস্ত্রানুরাগী সংগীতজ্ঞরা পরম সমাদর করে থাকেন।

এসবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ভরতের নাট্যশাস্ত্র। অনুমান করা যায় এর রচনাকাল প্রথম খৃষ্টাব্দের কিছু আগে থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অন্যান্য শাস্ত্রগুলি পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছে। এর আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে ভারতীয় সংগীতের শুরু সেই ঋক্‌বেদের যুগ থেকে। অবশ্য সুর ও সংগীতের উৎপত্তি মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে বলা চলে। পৃথিবীর মনীষী ও বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে আদিম মানুষ যেদিন থেকে পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়েছে সেদিন থেকেই নৃত্য ও সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সংগীত, নৃত্য ও চিত্র-কলা মানুষের প্রাচীনতম শিল্প, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি যাবতীয় সংগীতকে ভরত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—মার্গ সংগীত ও দেশী সংগীত। ব্রহ্মা মার্গ সংগীতকে চতুর্বেদ থেকে সংগ্রহ করেছেন, যাতে তা সুশ্রাব্য, মনোরম ও উপাদেয় হয়। এই জন্যে মার্গ সংগীতকে বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট সংগীত। শ্রোতার মনোরঞ্জন করা এবং তার মনে রস ও ভাব সৃষ্টি করা ছাড়াও মার্গ সংগীতের বড় লক্ষ্য হলো শ্রোতার অন্তরের সুপ্ত অধ্যাত্ম-বোধকে জাগ্রত করা। যে সংগীত দেশগত ও কালগত রুচির বশবর্তী হয়ে লোক-জনের মনোরঞ্জন করে থাকে তাই তো দেশী সংগীত!

যাই হোক, আধুনিক যুগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার বা পুনর্জীবনে যাঁরা সহায়তা করেছেন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁরা হলেন পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকার। যে-সংগীত হয়ে ছিল সংকীর্ণ নদীর মতো, যা ছিল স্বল্পপরিসরে আবদ্ধ কিংবা গোষ্ঠীগত—সেই সংগীতকে তাঁরা করলেন লোকায়ত। প্রাণ মন দিয়ে তাঁরা শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসার ও উজ্জীবনের কাজে লেগে গেলেন। আগে যেমন রাজা বাদশাহ্‌ কিংবা জমিদাররা সংগীতকে উৎসাহিত করতেন, পরবর্তী যুগে মধ্যবিত্ত মানুষ ও কিছু অবস্থাপন্ন মানুষই সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন সংগীতের সম্প্রসারণে।

একালে এলো গ্রামোফোন, রেডিও, নানা রকম সংগীত প্রতিষ্ঠান। এরাই এগিয়ে নিয়ে চললো সংগীতের প্রবাহকে।

খেলা ধূলা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

★ ভয় থেকে ভয়ঙ্কর ★

একটা বড়সড় বাড়ী তৈরী হবে। ভিত খোঁড়া হচ্ছে। শ্রমিকরা খুশী মনে কাজ করে চলেছে। কিছুদিনের মতো নিশ্চিন্ত। একটা ভালো কাজ পাওয়া গেছে। মনের আনন্দে তারা তাই মাটি খুঁড়ছে। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে চলছে তাদের কাজ। কেউ কেউ তো আবার গুন গুন করে গানও গাইছে। হঠাৎ একজন শ্রমিক ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে সে। ভয়ে তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। মুখটা শুকিয়ে চুন। ভয়-ভয় চোখে সে তাকিয়ে ছিল সদ্য খোঁড়া গর্তের দিকে।

গর্তের মধ্যে একটা মড়ার মাথার খুলি!

তাই দেখে অন্য শ্রমিকরাও ভয় পেয়ে গেলো। না, এখানে আজ কাজ-টাজ করা যাবে না। শেষকালে কি বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে? কেউ আর কাজ করবে না। শুধু তাই নয়, ঐ জায়গার কাছেও কেউ আর যেতে চায় না।

মহা মুশকিল! তাহলে কি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে? ঠিক তখনই একজনের মাথায় খেলে গেল বুদ্ধিটা।

সে বললো, "ধ্যাৎ, এতে ভয় পাবার কি আছে রে? এটা নিশ্চয়ই আমাদের শত্রুর মাথার খুলি। গলাটা কেটে এইখানে ঐ মাথাটা পুঁতে রাখা হয়েছিল।"

মুহূর্তের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো শ্রমিকদের মধ্যে। তারা বলে উঠলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক তাই। নির্ঘাত তাই। ঠিক বলেছিস তো!"

একজন বললো, "বের কর্ তো মাথাটা, দেখাচ্ছি মজা!"

গর্তের মধ্যে থেকে খুলিটা বের করে একজন ছুড়ে ফেলে দিল। আর একজন ছুটে গিয়ে সেটাকে মারলো এক লাথি। তারপর রাগে ঘেন্নায় সকলে মিলে মড়ার মাথার খুলিটাকে লাথি মারতে লাগলো। লাথিতে লাথিতে খুলিটা গিয়ে পড়লো একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখানে ছুটে গিয়ে সকলে মিলে সেই খুলিটাকে নিয়ে লাথালাথি খেলা শুরু করে দিল। এ মারে, তো ও ফেরত দেয়, আবার ও ফেরত দেয়, তো এ মারে।

এইভাবে মড়ার মাথা নিয়ে লাথালাথি করতে করতে ওদের মাথায় এসে গেল এক নতুন ধরনের খেলার কথা।

সেই খেলাই আজকের ফুটবল।

ঘটনাটা আজ থেকে কয়েক শ বছর আগের। ঘটেছিল ইংলণ্ডে। তাহলে কি ইংলণ্ডেই ফুটবল খেলার জন্ম? এ বিষয়ে কিন্তু নানা মুনির নানা মত। এক-একজন এক-এক রকম কথা বলেন। কেউ বলেন, চীনেই ফুটবল খেলার জন্ম। আর এক দল সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ফুটবল খেলার উৎপত্তি ইংলণ্ডেই। আরো এক দল আছেন যাঁরা কিন্তু অন্য কথা বলেন।

সে কথা থাক। মড়ার মাথার খুলি থেকে আজকের চামড়ার ফুটবলে আসতে কিন্তু কয়েক শ বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে আছে ভয়ংকর সব কাহিনী, রক্তাক্ত ইতিহাস।

এমন এক সময় ছিল যখন যুদ্ধে ধরা পড়া বন্দীদের মাথা কেটে নিয়ে ফুটবলের মতো খেলা হতো। শত্রুর মাথা নিয়ে লাথালাথি করে সে কালের লোকেরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

কিন্তু তারপরের কাহিনী আরো ভয়ংকর। ফুটবল খেলা আধুনিক রূপ নেবার কিছু কাল আগে পর্যন্ত চলেছিল খেলার মাঠে খেলা নিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রাম। হয়তো পাশাপাশি দুটি গ্রামের মধ্যে ফুটবল খেলা হবে। গ্রামের সব থেকে শক্তিশালী লোকরাই খেলবে। কিন্তু খেলার নামে সারা গ্রামে কান্নাকাটি পড়ে যেতো। যারা খেলতে যাবে, তাদের অধিকাংশই তো আর ফিরে আসবে না। খেলা তো নয়—ও তো যুদ্ধ। মরণপণ সংগ্রাম, জীবন-মৃত্যুর লড়াই।

তারপর খেলার নামে এই হানাহানির যুগও একদিন শেষ হলো। ফুটবল খেলা আস্তে আস্তে আধুনিক রূপ নিতে শুরু করলো। এক সময় ফুটবল খেলার আইন-কানুনও তৈরী হলো। নির্দিষ্ট হলো মাঠের সীমানা, নির্দিষ্ট হলো খেলোয়াড়ের সংখ্যা। তারপর একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলা হিসেবে নিজের স্থান পাকা করে নিল ফুটবল।

আধুনিক রূপ নিলেও ফুটবল কিন্তু আপন বৈশিষ্ট্য হারালো না। লড়াইয়ের ধারা রয়েই গেলো। আজকের ফুটবল খেলাও তাই দু দলের মধ্যে সংগ্রাম। সে সংগ্রাম জীবন-মৃত্যুর নয়—জয়-পরাজয়ের।

কলকাতার ময়দানেও সেই সংগ্রামের দিন এসে গেছে।

ময়দান এখন তাই প্রাণ-চঞ্চল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই ময়দানে সাড়া পড়ে যায়। হাজার হাজার লোক মাঠগুলিতে ভিড় জমান নিজের দলের খেলা দেখতে।

ময়দানের তিন প্রধানের দু দলই তো প্রথম দিকেই একটি করে পয়েন্ট হারিয়ে বসে আছে। মোহনবাগান মরশুমের প্রথম খেলাতেই খুইয়েছে একটি পয়েন্ট। ক্যালকাটা জিমখানার বিরুদ্ধে জিততে পারে নি তারা। মোহনবাগান আগে গোল দিয়েছিল। পরে সেই গোলটি শোধ করে দেয় ক্যালকাটা জিমখানা। ঠিক একই ফলাফল দেখা গিয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল আর পোর্ট কমিশনার্স দলের খেলায়। ইষ্টবেঙ্গল আগে গোল করেছিল। পরে সেই গোলটি শোধ করে দিয়ে পোর্ট দল গত বছরের লীগ ও ত্রি-মুকুট জয়ী ইষ্টবেঙ্গলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল একটি পয়েন্ট। সত্যি কথা বলতে কি, মোহনবাগান আর ইষ্ট-বেঙ্গল যে ঐ খেলা দুটিতে হেরে যায় নি—এই বোধহয় তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

★ স্বপন আর সুকল্যাণের চোখে ★

ফুটবল মরশুম শুরু হবার ঠিক আগে ইষ্টবেঙ্গলের অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত আর মোহনবাগানের দলপতি সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারকে তাঁদের দলের বিষয় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। দুজনেই ছিলেন আশাবাদী। দুজনেই বলেছিলেন, "ভালো খেলার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

কিন্তু এখনো কোন দলই ক্লাব সমর্থকদের খুশী করতে পারে নি। দু দলই ইতিমধ্যেই হোঁচট খেয়ে বসে আছে।

দল কেমন হলো? এই প্রশ্নের উত্তরে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত বলেছিলেন, "দল বেশ ভালোই হয়েছে। গত বছরের মতো এবারও আমরা ভালো খেলতে চেষ্টা করবো। মোহন সিং চলে যাওয়ায় হাফ লাইনে ইস্টবেঙ্গলের শক্তি একটু কমেছে ঠিকই। তবে সেই ঘাটতি পূরণ করে দেবার মতো খেলোয়াড় গৌতম সরকার আর সমরেশ চৌধুরী তো রয়েছেনই। আর বাড়তি লাভ চন্দন গুপ্ত। সি প্রসাদ চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু সুধীর, প্রবীর, অশোক, শ্যামল, সলিল আর অবনী তো কোন দিক দিয়েই কম যান না। রক্ষণভাগে ওঁরা দুর্ভেদ্য ব্যূহ গড়ে তুলতে পারবেন নিশ্চই। ফরোয়ার্ডে শম্ভু মৈত্র আর লতিফউদ্দিন দল ছাড়লেও এসেছেন সুভাষ ভৌমিক আর পরিমল দে। ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড লাইনে সুভাষ, স্বপন, আকবর আর হাবিবের সম্মিলিত আক্রমণ যে কোন দলের রক্ষণভাগকে তছনছ করে দিতে পারবে। আর গোলে অরুণের সঙ্গে আছেন শিবাজী ব্যানার্জী।"

সব শেষে স্বপন জানালেন যে, এইসঙ্গে প্রদীপ ব্যানার্জীর প্রশিক্ষণ আর গত বছরের অভাবনীয় সাফল্যের স্মৃতি তাঁদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

মোহনবাগানের অধিনায়ক সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারকে দলের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে গত বছরের চেয়ে এবারের দল অনেক শক্তিশালী। গত বছর নড়বড়ে হাফ লাইনের জন্যে মোহনবাগান বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। এ বছর মোহন সিং দলে আসায় (জনডিস হয়েছিল বলে প্রথম দিকে খেলতে পারেনি) হাফ লাইনের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। সেইসঙ্গে সুব্রত চ্যাটার্জী আর কাজল মুখার্জীও এসেছেন। শ্যামসুন্দর মান্না তো আছেনই। বরুণও খেলবেন। এঁদের পেছনে নঈম, নিমাই গোস্বামী, কাজল ঢালি, বিজয় দিগপতি, সুনীল ভট্টাচার্য থাকবেন।

ফরোয়ার্ড লাইনও যথেষ্ট শক্তিশালী। সুভাষ ভৌমিক চলে গেছেন বটে, কিন্তু এসেছেন সর্দার খাঁ, এসেছেন কান্নান। সত্যি কথা বলতে কি, সুকল্যাণ, সুরজিৎ, সর্দার নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝি করে খেলতে পারলে যে কোন দলই বিপদে পড়বে। এঁদের পাশে থাকবেন কান্নান, প্রদীপ দত্ত, বিনয় পাঁজা প্রভৃতি।

তাই সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের ধারণা, মোহনবাগান এবার ভালোই খেলবে।

● বিজয় জীবনের সেরা খেলা খেলেছিলেন ●

ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলার তখন আর কোন আকর্ষণই নেই। অষ্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ৪-০ খেলায় এগিয়ে গেছে। তখনই আরম্ভ হলো ভারতের উনিশ বছরের বিজয় অমৃতরাজের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্বের ফিরতি সিঙ্গলসের খেলা। আর তখন তিনবার উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন জন নিউকম্বের বিরুদ্ধে বিজয় তাঁর জীবনের সেরা খেলা খেলতে সুরু করেছিলেন। একটানা আশি মিনিট লড়াই চালাবার পর নিউকম্ব ১২-১০ গেমে প্রথম সেটটি পেয়েছিলেন শুধু তাঁর অভিজ্ঞতার জোরেই। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে বিজয় মাত্র পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ৬-৩ গেমে নিউকম্বকে হারিয়ে দেন। আর তারপরই মাঠে আলো কমে যাওয়ার জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

জন নিউকম্বের বিরুদ্ধে বিজয় অমৃতরাজের খেলা দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়েছিল। অভিজ্ঞ এবং বর্ষীয়ান নিউকম্বের বিরুদ্ধে বিজয় সমানে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছিলেন। প্রতিটি গেম পয়েন্টের জন্য নিউকম্ব ও বিজয়কে লড়াই চালাতে হয়েছিল। নিউকম্বকে এক-এক সময় বিজয় তাঁর জোরালো সার্ভিস, ব্যাক হ্যান্ড ও ফোর

হ্যাণ্ডের মার, ব্যাকহ্যাণ্ডের চাপ ও স্ম্যাসিংয়ের জোরে কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। নিউকম্বকে পর্যন্ত বিজয়ের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল।

অন্য চারটি খেলায় অস্ট্রেলিয়া অনায়াসে জিতেছিল। প্রথম দিনে নিউকম্ব ৬-২, ৬-১ ও ৬-০ সেটে আনন্দ অমৃতরাজকে এবং ম্যাল অ্যাণ্ডারসন ৬-১, ৬-২ ও ৬-১ সেটে বিজয় অমৃতরাজকে হারিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিনে ডাবলসের খেলায় নিউকম্ব ও জিওফ মাস্টার্স ৪-৬, ৬-২, ৭-৫ ও ৬-৩ সেটে প্রেমজিৎ লাল ও বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন। তৃতীয় দিনে ফিরতি সিঙ্গলসের একটি খেলা হতে পেরেছিল। সেই খেলায় জন কুপার ৪-৬, ৬-০, ৮-৬ ও ৬-১ সেটে প্রেমজিৎলালকে হারিয়ে দিয়েছিলনে।

★ স্ম র ণী য় যাঁ রা ★

ছেলেটিকে খেলতে দেখেছিলেন রাজেন সেন ভাগ্য-ক্রমে মাঠে। আর কলকাতায় ফেরার পথে স্টিমারে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মোহনবাগানের সম্পাদক শৈলেন বসুর। ছেলেটি পড়তো উত্তর কলকাতার স্কুলে আর খেলতো কুমারটুলির ক্যালকটা ইউনিয়ন ক্লাবে।

পরের বছরই মোহনবাগান ক্লাব থেকে ডাক পেল ছেলেটি। সে তো ভাবতেই পারেনি মোহনবাগানের মতো দলের কাছ থেকে ডাক পাবে। একটু ভয়ে ভয়েই খেললো সে। খেললো রাইট হাফে। তেমন কিছু না খেললেও তার পায়ের লম্বা লম্বা সট দেখে মোহনবাগানের নির্ভর-যোগ্য ব্যাক সুকুল ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, তাঁর পাশে ওকেই খেলাবেন। সুধীর চ্যাটার্জী খেলা ছেড়ে দিচ্ছেন। তাই একজন ভালো খেলোয়াড় চাই।

কদিন বাদে মোহনবাগানের খেলা ব্ল্যাকওয়াচের সঙ্গে। ব্ল্যাকওয়াচ সেবার দারুণ শক্তিশালী দল। ছেলেটিও মাঠে এসেছে। খেলতে নয়—খেলা দেখাই বোধহয় তার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে যা ভাবতে পারেনি তাই হলো। তাকে দেখেই সুকুল বললেন, "এসো, তুমি খেলবে আমার সঙ্গে।"

সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ছেলেটি। আর সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেনঃ অতোটুকু একটা ছেলেকে ব্ল্যাক-ওয়াচের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলানো মোটেই ঠিক হচ্ছে না, ওর জন্যেই আজ মোহনবাগান ডুববে।

সুকুল কিন্তু কারো কথাই শুনলেন না। জোর করে খেলালেন সেই ছেলেটিকে। কিন্তু ক' মিনিট কাটতে না কাটতেই সারা মাঠ ফেটে পড়লো প্রশংসায়। কি খেলাই না খেলছে সতেরো বছরের ছেলেটি! তাকে আর সুকুলকে কাটাতে ব্ল্যাকওয়াচের বাঘা বাঘা ফরোয়ার্ডরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

কে সেই ছেলেটি? হ্যাঁ, সেই ছেলেটিই গোষ্ঠ পাল। ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এখনো তিনি হাসপাতালেই আছেন। তবে ভালো আছেন। চিন্তার কোন কারণ নেই।

গোষ্ঠ পালের নামই তাঁর পরিচয়। তাঁর মতো খেলোয়াড় শুধু বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে আর হয়ত জন্মাবে না। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করার কিছু পরেই গোষ্ঠ পাল কলকাতার ময়দানে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর সেই সুযোগই তাঁকে এনে দিয়েছিল শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আর টেনে তুলেছিল শিরোনামে।

সে যুগে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গোরা আর সাহেবদের দলগুলো। তারা খেলতো বুট পরে। কিন্তু গোষ্ঠ পালকে ডিঙিগয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। চীনের প্রাচীরের মতো একাই একশ হয়ে গোষ্ঠ পাল দাঁড়িয়ে থাকতেন মোহনবাগানের গোল আগলে। তাই তাঁকে সাহেবরা 'চাইনিজ ওয়াল' বলে অভিহিত করতো। গোষ্ঠ পাল খেলেছেন একটানা ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯২১ থেকে ২৬ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মোহনবাগানের অধিনায়ক তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল ১৯৩৩ সালে সিংহল সফরে গিয়েছিল। সেখানে অনুষ্ঠিত পাঁচটি খেলার মধ্যে চারটিতেই জিতেছিল ভারতীয় দল।

ফুল ব্যাক হিসেবে গোষ্ঠ পাল ছিলেন ভারতের সেরা খেলোয়াড়। কামানের গোলার মতোই ছিল তাঁর পায়ের সট।

পরিচালক ঃ
নিরাপদ রায়

শিশু সাহিত্যের ভগীরথ

• স্বপনবুড়ো •

বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের একটি চরম দুর্ভাগ্য যে, আমরা অতি সহজেই সাহিত্যের পূর্বসূরীদের মন থেকে মুছে ফেলি।

বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে যিনি একদিন "অজগর আসছে তেড়ে" কিংবা "হারাধনের দশটি ছেলে" দিয়ে অতি সহজেই সারা দেশের শিশু-কিশোর-কিশোরীর অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন, সেই শিশু-সাহিত্যের ভগীরথ যোগীন্দ্র নাথ সরকারকে আমরা পাঠক হিসেবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভুলতে সুরু করেছি।

একদা যিনি ছড়া কেটেছিলেন—

"ধন ধন ধন ধন!
বাড়ীতে ফুলেরই বন
এ ধন যার ঘরে নেই তার
কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে—
তারা আগুনে পুড়ে কেন না মরে?"

—সেই শিশু-চিত্ত-জগতে সাড়া-জাগানো আনন্দময় পুরুষটিকে আমরা আজ শিশু সাহিত্যের আনন্দ-আসর থেকে কত সহজে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছি!

যোগীন্দ্রনাথ একদা ছড়া দিয়ে, গল্প দিয়ে, কাহিনী রচনা করে, পশু পক্ষীর মজার কথা শুনিয়ে, দেশ বিদেশের কাহিনী জানিয়ে এক আনন্দময় মায়াপুরীর সৃষ্টি করে-ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্য আলোচনার জন্যে, তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য আমরা কতটুকু চেষ্টা করেছি?

ওদেশে হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে যে সম্মান পেয়েছেন, তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে গুণমুগ্ধ দেশবাসী যেভাবে তাঁর মূর্ত্তি নির্মাণ করে নগরের মাঝখানে স্থাপন করেছেন, আমরা সেই অনুপম উদাহরণেও উদ্বুদ্ধ হইনি।

ভরসার কথা এই যে, যোগীন্দ্রনাথের বিদুষী নাতনী ডঃ রঞ্জিতা কুণ্ডু তাঁর দাদা মশায়ের একটি সুন্দর জীবন-চরিত লিখে অকৃতজ্ঞ দেশবাসীর অক্ষমতাকে খানিকটা লাঘব করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

ডঃ রঞ্জিতা কুণ্ডু বহু পরিশ্রম স্বীকার করে এই প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিকের সৃষ্ট সাহিত্য-সম্ভার মূল্যায়নের জন্য যে অনুশীলন করেছেন তা দেখে আমরা তাঁর সত্যানু-সন্ধানের ভূয়সী প্রশংসা করি।

যোগীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর সাহিত্যের মাল মশ্‌লা সংগ্রহ করে অতি নিপুণ কারিগরের মতো বাংলার শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন, কল্যাণীয়া রঞ্জিতা একজন গবেষকের মন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেই তথ্যগুলি অতি সুন্দর ভাব ও ভাষায় আমাদের পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থখানিতে রঞ্জিতা এমন বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা আমাদের ইতিপূর্বে জানা ছিল না।

আর একটি বিষয়ে লেখিকার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। সদা-প্রসন্ন হাস্যরসিক ও শিশুদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে রস ও রসিকতা পরিবেশন করতেন এবং কথায় কথায় মধুর ছড়া কেটে তাঁর নাতি-নাত্‌নীদের উৎফুল্ল করে তুলতেন সে কথাও লেখিকা সুকৌশলে গ্রন্থখানির মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন।

দুইটি খণ্ডে এই জীবন-চরিতটি রচিত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ যে সর্বপ্রথম স্বদেশী গানের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, সে কথাও পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানির শেষে যোগীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলীর একটি তালিকা সন্নিবেশিত হওয়ায় এই জীবন-চরিতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

* **শিশু সাহিত্যের ভগীরথ**— ডঃ রঞ্জিতা কুণ্ডু। প্রকাশক—ইন্টার ন্যাশনাল লিটেরেচর এসোসিয়েশন। ১৯, এস্. এন. ব্যানার্জি রোড। কলিকাতা-১৩।

মূল্য—পনেরো টাকা॥

দুই

ব্যায়াম শুরু করার আগে যতটা সম্ভব খোলামেলা জায়গা বেছে নেবে, কারণ ব্যায়াম তো শুধু শরীরের মাংসপেশী নিয়ে নাড়াচাড়া নয়, স্বাভাবিক ও সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসও ব্যায়ামের একটা প্রধান অঙ্গ। সাধারণত ভোর ও বিকেল-বেলা ব্যায়ামের পক্ষে উপযুক্ত সময়। ভরা পেটে ব্যায়াম করতে নেই।

ভাল কথা, ব্যায়ামের গোড়ার দিকে গা-হাত-পা একটু ব্যথা হতে পারে, কিন্তু সে মাত্র দু-একদিনের জন্য। তাই ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।

আরও একটা কথা, খালি হাতে ব্যায়াম শুধু ছেলেরা নয় মেয়েরাও স্বচ্ছন্দে করতে পারে। এর ফলে মেয়েদের শরীরের কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে এটা খুব ভুল ধারণা। বরং পুষ্ট স্বাস্থ্য তাদের শরীরে লালিত্য এনে দেবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। গ্রীক ভাস্কর্যে শক্তিমান পুরুষ হিসেবে হারকিউলিস আর সুন্দরী রমণী হিসেবে ভেনাসকে কল্পনা করা হয়। ভেনাসের মর্মর মূর্তি লক্ষ্য করলে তার সুগঠিত কাঁধ ও পেটের মাংসপেশী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু তাই বলে তার চেহারা পুরুষালী, তা কি কেউ বলতে পারবে? অমন সুঠাম তনু আজ পর্যন্ত কোন নারীর মধ্যে কল্পনাও করা সম্ভব হয়নি। তিনি তো শুধু সৌন্দর্যের রাণীই নন, সৌন্দর্যের দেবী।

এবার কয়েকটা ব্যায়াম শুরু করা যাক্, কি বল? একটা কথা বলি। কতক্ষণ ধরে ব্যায়াম করা উচিত, এ প্রশ্ন হয়ত তোমাদের কারো কারো মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। এ ব্যাপারে কিন্তু বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। যতক্ষণ না শ্রান্তি আসছে, দম শেষ হয়ে আসছে, ততক্ষণ অবধি ব্যায়াম করে যাও।

(৩) দু'পা জোড়া করে কিংবা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াও। হাত দুটো স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন থাকে তেমনভাবে পাশে ঝুলিয়ে দাও। এবার নিশ্বাস নিতে নিতে একদমে হাত দুটোকে উপুড় অবস্থায় দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে (১নং ব্যায়ামের মত) মাথার ওপর সমান্তরাল রেখায় তোল। হাত তোলার সময় একবারও থামবে না, অর্থাৎ নীচ থেকে দু'হাত ওঠাবার সময় 'মোশান' বা গতির ছেদ পড়বে না। আবার নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটোকে পাশে নামিয়ে আন। পায়ের জোড়ালি তুলতে পারলে ভাল, না পারলে ক্ষতি নেই। হাত ওঠাবার সময় জোরে নিশ্বাস নেবে, নামাবার সময় হাত

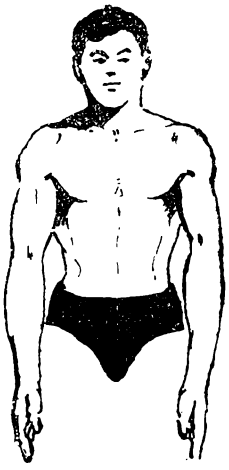
৩নং ব্যায়াম 'ক'

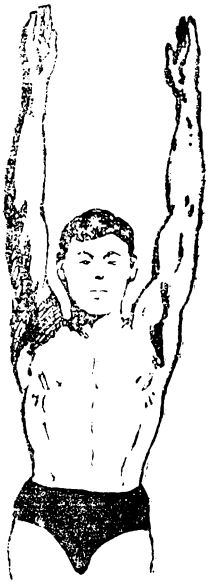
৩নং ব্যায়াম 'খ'

আলগা করে মুঠো করবে। এই ব্যায়ামে বুকের গড়ন হবে সুন্দর, কাঁধ ও পিঠের মাংস পেশীতেও চাপ পড়বে।

(৪) ৩নং ব্যায়ামের ভঙ্গীতে দাঁড়াও। এবার কিন্তু হাত দুটো পাশে ছড়াবে না, ২নং ব্যায়ামের মত সামনে সমান্তরালভাবে মেলে দেবে। তারপর দু-কানের পাশ দিয়ে একেবারে মাথার ওপর তুলে সমান্তরাল রেখায় নিয়ে এস। হাত আবার নামিয়ে আন। হাত নীচ থেকে ওপরে তোলা এক দমে হবে অর্থাৎ কোথাও ছেদ পড়বে না বা থামবে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস ৩নং ব্যায়ামের মতই হবে। এই দুটো (৩নং ও ৪ নং) ব্যায়ামেই নিশ্বাস একটু জোরে নেবে আর ছাড়বে, কারণ এটা নিশ্বাস প্রশ্বাসেরও ব্যায়াম। ভাল কথা, হাত নামাবার সময় মুঠো করতে ভুলবে না কিন্তু।

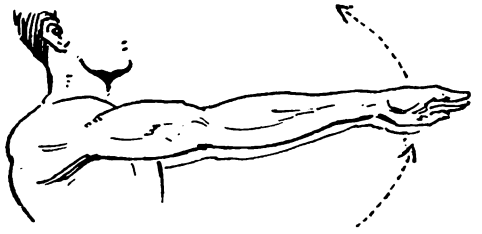

৪নং ব্যায়াম 'ক'

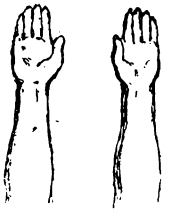

৪নং ব্যায়াম 'খ'

(৫) দু-পা জোড়া কিংবা সামান্য ফাঁক করে বুক টান টান করে দাঁড়াও। হাত দুটো মুঠো করে চিতিয়ে পাখীর ডানার মত দুপাশে ছড়িয়ে দাও। এবার পালা করে একবার ডান হাত আর একবার বাঁ হাত মুঠো অবস্থায় কনুই ভেঙে কাঁধ বরাবর নিয়ে এস। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না তো? এক কথায়, ডান হাতের মুঠো যখন ডান কাঁধের কাছে আসবে, তখন বাঁ হাত ছড়ানো থাকবে আর বাঁ হাতের মুঠো যখন বাঁ কাঁধের কাছে এসে পৌঁছুবে, তখন ডান হাত আবার ছড়িয়ে দিতে হবে। ডান হাত যখন গুটিয়ে আনবে, তখন নিশ্বাস নেবে আর যখন বাঁ হাত গুটিয়ে আনবে, তখন নিশ্বাস ছাড়বে। এটা হাতের গুলি বা বাইসেপসের ব্যায়াম।

(৬) ৫নং ব্যায়ামের ভঙ্গীতে দাঁড়াও। হাতদুটো চিতিয়ে সামনের দিকে সমান্তরালভাবে মেলে দাও। দুটো হাতই মুঠো থাকবে। এবার পালা করে (একটার পর একটা) ডান আর বাঁ হাত কনুই মুড়ে কাঁধের কাছে নিয়ে এস। ৫নং ব্যায়ামের মতই, তফাত শুধু হাতদুটো এবার দু'পাশে ছড়িয়ে দেবে না, সামনের দিকে মেলে দেবে। নিশ্বাস-

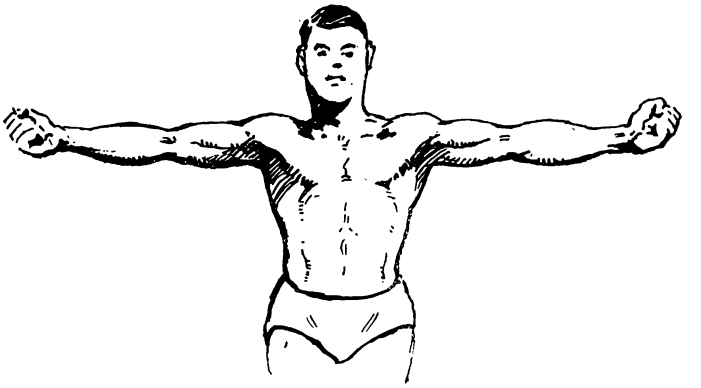

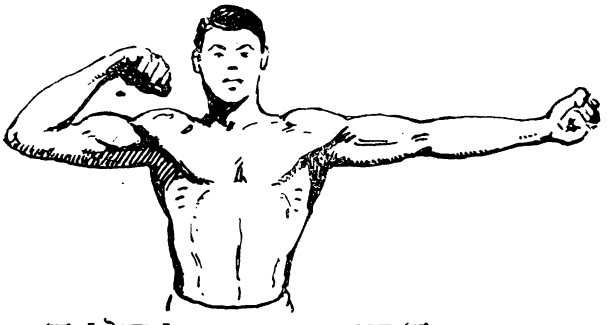

৫নং ব্যায়াম 'ক' [উপরে]　　৫নং ব্যায়াম 'খ'

প্রশ্বাসও ৫নং ব্যায়ামের মত হবে। বাহু, হাতের গুলি এবং কিছুটা পুরোবাহুর ব্যায়াম এটা। তাড়াহুড়ো করবে না আর মেলে দেওয়া হাত দুটো যেন কাঁধের রেখা বরাবর থাকে—উঠে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

৬নং ব্যায়াম 'ক'

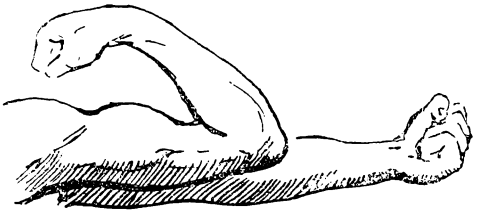

৬নং ব্যায়াম 'খ'

নতুন চারটে ব্যায়াম শেখা হল, এবার একটা মজার ঘটনা বলি।

সে অনেকদিন আগের কথা। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় দু' ভদ্রলোক এক সন্ধ্যায় খেতে গিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁরা পাশের 'বিলিয়ার্ড রুমে' ঢুকলেন, ইচ্ছে বিলিয়ার্ড খেলবেন।

বিলিয়ার্ড বোর্ড হল অনেকটা ক্যারাম বোর্ডের মত কিন্তু আকারে অনেক বড় (প্রায় বার ফুট)। বোর্ডের চার কোণায় চারটে আর দুপাশের মাঝখানে একটা করে মোট ছটা 'হোল্' বা গর্ত থাকে।

বিলিয়ার্ডে তিনটে বল থাকে, দুটো সাদা (একটায় আবার কালো তিলের মত চিহ্ন থাকে) আর একটা লাল। এটা সাধারণত দুজনের খেলা। প্রথম খেলোয়াড় কালো ফুটকি দেওয়া সাদা বল আর লাল বল নিয়ে খেলা শুরু করে। বোর্ডের সামনের দিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় লাল বলটাকে রাখতে হয়, ওটাকে বলা হয় 'রেড স্টপ'। রেড স্পটের উলটো দিকে 'ডি'র মধ্যে চিহ্নিত স্থানে সাদা বলটা রেখে খেলোয়াড়কে একটা লাঠি দিয়ে (লাঠি অবশ্য ঠিক নয়, ওটাকে বলে 'কিউ') বলটাকে এমন ভাবে আঘাত করতে হবে যে, ওটা গিয়ে লাল বলে লাগবে। 'রেড' যদি গর্তে পড়ে যায় তবে ওটাকে তুলে আবার রেড স্পটে বসাতে হয়।

দ্বিতীয় খোলোয়াড় যখন খেলবে, সে তখন দ্বিতীয় সাদা বলটা ওই 'ডি'র মধ্যে বসিয়ে খেলা শুরু করবে। নিজের বল রেড কিংবা অন্য বলে লেগে গর্তে পড়লে যেমন পয়েন্ট হয়, তেমন একটা বলে লেগে অন্যটায় লাগলে তাকে বলে 'ক্যানন্'। যতক্ষণ পর্যন্ত পয়েন্ট হাতে থাকবে, একজন খেলোয়াড় খেলা চালিয়ে যাবে। এভাবে যে 'স্কোর' হয়, তাকে 'ব্রেক' বলে। সেই খেলোয়াড় 'মিস্' করলে অথবা কোন স্ট্রোকে পয়েন্ট না পেলে অন্যজন খেলা শুরু করে। একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছানো না পর্যন্ত দু'জন খেলোয়াড়ই পালা করে খেলতে থাকে। যে খেলোয়াড় আগে নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছুবে, সেই জিতবে। এই খেলায় আরও নিয়ম আছে, কিন্তু তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

এবার আমরা আসল ঘটনায় ফিরে যাই। ওই দুই ভদ্রলোক বিলিয়ার্ড রুমে ঢুকে দেখলেন দুজন খেলোয়াড় বিলিয়ার্ড খেলছেন আর বোর্ডের দুপাশে অনেকে ভিড় করে খেলা দেখছেন। আমাদের পরিচিত ভদ্রলোক দুজন কি আর করেন, দুটো চেয়ার টেনে বোর্ডের সামনে বসে পড়লেন। খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা গল্প-গুজব করতে লাগলেন। ভদ্রলোক দুজনের মধ্যে একজন ফরাসী আর একজন অন্য দেশী।

যিনি খেলছিলেন তাঁর বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। তাঁর মারগুলো (স্ট্রোক) কিন্তু তেমন জুতসই হচ্ছিল না। একবার একটা খারাপ স্ট্রোকের সময় ভিনদেশী সেই ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীর একটা কথায় হেসে উঠলেন আর খেলোয়াড় ভদ্রলোক মনে করলেন তাঁকে বিদ্রূপ করেই ওই ভদ্রলোক হেসেছেন। তিনি ভদ্রলোকের সামনে তেড়ে-মেড়ে এগিয়ে এসে অপমানজনক কিছু বললেন। ভদ্রলোক ফরাসী ভাষা না জানলেও কথাগুলো যে তাঁর কানে মধু ঢালার মত নয় তা বুঝলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর সঙ্গী ফরাসী ভদ্রলোকটি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, তাঁকেও তিনি নিরস্ত করে বললেন, "আঃ কি কর! যেতে দাও।"

ফরাসী ভদ্রলোকটি মনে মনে আহত হলেন, তাঁর সঙ্গীকে কাপুরুষ ভাবলেন। এখানে বলে রাখি, যাঁর প্রতি কটূক্তি করা হয়েছিল তাঁর চেহারা খুব সুপুরুষ হলেও পোশাক পরা অবস্থায় তাঁকে কিন্তু বলিষ্ঠ মানুষ মনে হবার কোন কারণ ছিল না।

যাহোক, দ্বিতীয়বার ওই একই ঘটনা ঘটল। হাসি-ঠাট্টার কথায় ভিনদেশী ভদ্রলোক হেসে উঠলেন আর খেলোয়াড়টি ভাবলেন, তাঁকেই ব্যঙ্গ করা হল। এবারও তিনি এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের প্রতি কটূক্তি করলেন। এবার কিন্তু আর সঙ্গী ফরাসী ভদ্রলোকটি মুখ বুজে অপমান হজম করতে রাজী হলেন না। তাঁকে লক্ষ্য করে বলা না হলেও এ অপমান তাঁর গায়েও লাগল, কারণ ভিনদেশী ভদ্রলোকটিকে তিনিই ওই রেস্তোরাঁয় অতিথি হিসেবে নিয়ে এসেছেন। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গী কিন্তু ব্যাপারটা আগেই আঁচ করেছিলেন। একটা হাত বাড়িয়ে খপ করে তিনি তাঁর বন্ধুর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরলেন। ফরাসী ভদ্রলোকের মনে হল, কাঁধ থেকে তাঁর পুরো হাতটাই যেন খসে এল—বজ্রের মত সেই মুষ্টি! বিস্ময়ে তিনি থ' বনে গেলেন।

আবার খেলা শুরু হ'ল। এমন দুর্ভাগ্য, কি একটা রসিকতায় ভিনদেশী ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন আর খেলোয়াড় ভদ্রলোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। বলিষ্ঠ চেহারার সেই খেলোয়াড় বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর 'কিউ'টা ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এলেন, তারপরই চেয়ারে বসে থাকা ওই ভদ্রলোকের মুখে এক ঘুঁষি মারলেন। ঘুঁষিটা নাকে লাগল আর গল গল করে বেরিয়ে আসা রক্তে ভিনদেশীর পোশাক নষ্ট হয়ে গেল—নতুন পোশাক, সেদিনই প্রথম গায়ে দিয়েছেন। খেলোয়াড়টি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিলিয়ার্ড বোর্ডের কাছে ফিরে গেলেন। ঘরে যারা ছিলেন তারা কেউ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করতে সাহস করলেন না।

ভিনদেশী ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরলেন। রক্ত মুছে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মার খাওয়ার জন্যে নয়, নতুন পোশাকটা নষ্ট হওয়ায় তাঁর রাগ হল। তিনি খেলোয়াড়টির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপরই এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা দেখে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল—নিজের চোখকেই তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না!

কেউ কিছু বোঝবার আগেই ভিনদেশী ভদ্রলোক এক হাতে বলিষ্ঠ সেই খেলোয়াড়ের ঘাড় চেপে ধরলেন আর অন্য হাত কোমরের পেছনে রেখে চোখের নিমেষে তাঁকে শূন্যে তুলে ফেললেন। ওই অবস্থায় খেলোয়াড়ের দেহ ধনুকের মত বাঁকিয়ে মাথাটা বার কয়েক হাঁটুতে ঠুকে তিনি তাঁকে বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। বোর্ড ভেঙ্গে চুরমার, খেলোয়াড়টিও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। হইহই

[শেষাংশ ৭১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

'বহুবিবাহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর বিদ্যাসাগর একদিন পরিহাস ছলে বলেন—ইংলণ্ডে গেলে বহুবিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করে ছেপে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে এক কপি উপহার দিয়ে বলতাম —মেয়ে রাজার দেশে মেয়েদের দুঃখ ঘোচে না কেন?

কবি হেমচন্দ্র অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। কেউ হাল্কাভাবে সমালোচনা করলেও তাঁর অন্তরে লাগত। হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে বলতেন—'অন্য কবিদের কবিতা বাঁচিয়ে রাখে, আমি আমার কবিতা নিজে বাঁচিয়ে রাখব।'

শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্বামী' উপন্যাসটি রচনা করে কোন নাম না দিয়ে চিত্তরঞ্জনের কাছে পাঠিয়ে দেন 'নারায়ণে' প্রকাশের জন্য। চিত্তরঞ্জন উপন্যাসটির নাম দেন 'স্বামী' এবং প্রকাশ করেন। প্রকাশের পর দেশবন্ধু একখানি ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠিয়ে শরৎচন্দ্রকে লিখলেন—"আপনার মত সাহিত্যিকের রচনার মূল্য অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা যায় না, আমি একখানি সাদা চেক পাঠালাম, আপনি কোন সঙ্কোচ না করে ইচ্ছামত অঙ্ক বসিয়ে নেবেন।"

চিত্তরঞ্জনের এই ঔদার্যে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হন, তিনিও ততোধিক ঔদার্য দেখিয়ে মাত্র একশ টাকা লিখে চেকটি ভাঙান। অথচ অন্যত্র যে কোন পত্রিকায় দিয়ে তিনি পাঁচশ টাকা পেতে পারতেন!

মহাজীবনের

॥ শৈলেনকুমার দত্ত

মাইকেল মধুসূদন একদিন চুঁচুড়া থেকে ফিরছিলেন। ট্রেনে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জমিদার—গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর দুই পুত্র কৃষ্ণলাল ও নন্দলাল তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। আলাপের পর তাঁরা মধুসূদনকে জিজ্ঞেস করেন তাঁদের দুজনকে এক ঘণ্টা করে ইংরেজি পড়ালে তিনি কত টাকা পারিশ্রমিক নেবেন।

মধুসূদন বলেন—Five hundred rupees.

কৃষ্ণলাল সবিস্ময়ে বলেন—Five hundred rupees for one hour's teaching, Sir, is not a common sum.

মধুসূদন তৎক্ষণাৎ জবাব দেন—My dear boys, You should also remember that Michael Madhusudan Dutta is not a common man!

আজ যে ভারতবর্ষে বাটিক প্রিন্টের এত সমাদর, এটি প্রথম এদেশে আমদানী করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জাভা ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। জাভায় এই বাটিক শিল্প দেখে কবি মুগ্ধ হন এবং সুরেন্দ্রনাথকে এই শিল্প শিখে আসতে বলেন। কাপড়ে মোম দিয়ে কি করে কারুকার্য করতে হয় এবং কি কি সরঞ্জাম লাগে সুরেন্দ্রনাথ সব জেনে নেন।

দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী মারফৎ এই শিল্প সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত করেন রবীন্দ্রনাথ এবং শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চিত্তরঞ্জন যখন বন্দী ছিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র তাঁর বিছানা পেতে দিতেন, কাপড় কাচতেন, আর ব্যারিস্টার কিরণ শঙ্কর রায় তাঁর জন্য রান্না করতেন।

একদিন তদানীন্তন বিদেশী জেল-সুপারিনটেণ্ডেন্ট চিত্তরঞ্জনকে রহস্য করে বলেন—"Mr. Das, You are a very costly prisoner ; you have got one barrister Cook and an I. C. S. Servant."

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব একদিন সভাস্থ পণ্ডিতদের একটি কবিতা রচনা করতে আদেশ দেন যার মধ্যে "বড়শী দ্বারা চন্দ্রকে ধৃত করণ ভাব" প্রকাশিত হয়। সকলে ব্যর্থকাম হলে বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরকে তলব করা হয়। হরু ঠাকুর তখন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই এলেন রাজসভায়। মহারাজার তলব পেয়ে তৎক্ষণাৎ রচনা করেন—

একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি
ধূলায় পড়িয়া কৃষ্ণ কাঁদে।
(রাধা) অঙ্গুলি হেলায়ে ধরে, মৃত্তিকা বাহির করে
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥

মহারাজা প্রীত হয়ে হরু ঠাকুরকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন। হরু ঠাকুর গামছা বেঁধে টাকা নিয়ে সিমুলিয়া ফেরেন।

বারাসতে একদিন নেমতন্ন খেতে গেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী 'ফার্স্ট বুক'-এর অমর লেখক

ম ণি ক ণা

সংগৃহীত ॥

প্যারীচরণ সরকার। তিনি বেশ খেতে পারতেন। সকলের খাওয়া যখন প্রায় শেষ, তখন একজন ভদ্রলোক বারাসতের বিখ্যাত ছানাবড়া কে কখানা খেতে পারেন জিজ্ঞেস করেন। প্যারীচরণ বললেন যে, তিনি এক সের খেতে পারেন। তক্ষুণি ছানাবড়া এল, প্যারীচরণ সকলের চেয়ে বেশি খাবার পরও সহাস্য বদনে এক সের ছানাবড়া খেয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন।

মণীষী কৈলাসচন্দ্র বসুর ভগিনী ছিলেন 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রণেতা উমেশচন্দ্র মিত্রের পত্নী। ইনি অতি বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা রমণী ছিলেন।

একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই মহিলাকে 'ভায়ের সহিত দেখা বৎসরের পরে' লাইনটির—পাদপূরণ করতে বলেন।

বালিকা-বধূ তৎক্ষণাৎ জবাব দেন—'ঘটা করে দিব ফোঁটা অতি সমাদরে।'

ভারতবর্ষে আসার পর মিস ম্যাকলাউড একদিন বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—'স্বামীজি, কিভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—'ভারতবর্ষকে ভালবাস।'

পটলডাঙার পথ দিয়ে একদিন বিদ্যাসাগর যাচ্ছিলেন। তিনি খুব হন হন করে হাঁটতেন, তাই চলতে গিয়ে এক ভদ্রমহিলার গায়ে তাঁর চটিজুতোর ধুলো লাগে।

বিদ্যাসাগরের বেশভূষা দেখে ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে বলে ওঠেন—'আ মর উড়ের তেজ দেখ!'

[এই আধারে ঃ ৭১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কান্ড, ডাক্তার এল, পুলিশ এল, যা হোক্ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মিটে গেল।

ওপরের ঘটনার পর কয়েক দিন কেটে গেছে। প্যারিসের একটা নামকরা প্রেক্ষাগৃহে তখনকার একজন বিখ্যাত ব্যায়াম-বীরের শক্তি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। হল ভর্তি লোক। দোতলার একটা দামী আসনে বসেছিলেন সেদিনের খেলোয়াড়, তিনিও ব্যায়ামবীরের খেলা দেখতে এসেছেন।

পর্দা ওঠার পর সবাই দেখল, মঞ্চে গ্রীক দেব-দেবী ও বীরপুরুষদের মর্মর মূর্তি সাজানো রয়েছে। অ্যাপলো, হারকিউলিস আরও সব মূর্তি। হঠাৎ সকলে চমকে উঠল। হারকিউলিসের মূর্তিটা যে নড়ছে। সকলের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে মূর্তিটা নড়ে চড়ে জীবন্ত আকার নিল, তারপরই সজীব সেই মূর্তি মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে মাংস পেশী সঞ্চালনের খেলা দেখাতে লাগল। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেমন সুপুরুষ চেহারা তেমন খোদাই করা মাংস-পেশী ব্যায়ামবীরের, চোখ ফেরানো যায় না। সত্যিই যেন ভাস্করের কল্পনার হারকিউলিস মানুষের দেহ নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দোতলার দামী আসন থেকে আমাদের পূর্ব-পরিচিত খেলোয়াড় ভদ্রলোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলেন, ব্যায়ামবীর আর কেউ নন, সে রাতে বিলিয়ার্ড রুমে যাঁকে অপমান করতে গিয়ে তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোক।

প্রদর্শনী শেষ হবার পর ব্যায়ামবীর পোশাকের ঘরে জামা-কাপড় বদলাচ্ছেন, এমন সময় একজন পরিচারক একটা কার্ড তাঁর কাছে নিয়ে এল। ব্যায়ামবীর দেখলেন, কার্ডে একজন ডিউকের নাম লেখা—তিনি দেখা করতে চান।

আমাদের দেশে আগে যেমন জমিদাররা ছিলেন, ওদেশে ডিউকরাও ছিলেন তেমন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ। ব্যায়াম-বীরের নির্দেশে পরিচারক ডিউককে ভেতরে নিয়ে এল। ডিউক ঘরে ঢুকেই করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। ব্যায়ামবীর সবিস্ময়ে দেখলেন ডিউক আর কেউ নন, সেদিনের বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়! করমর্দনের পর ডিউক বললেন, "আপনার হাতে সেদিন উচিত শিক্ষা পেয়েছিলাম বলে আজ আমি গর্ব অনুভব করছি।"

এই ব্যায়ামবীরটি কে জান? পৃথিবী-বিখ্যাত ইউজিন স্যাণ্ডো। হারকিউলিস যে শুধু ভাস্করের কল্পনাই নয়, কঠিন শক্তি সাধনায় মানুষও অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী হতে পারে, হতে পারে গ্রীক মহাবলী হারকিউ-লিসের মত পেশী বহুল বলিষ্ঠ পুরুষ, তাই প্রমাণ করে-ছিলেন ইউজিন স্যাণ্ডো। তাঁর চাইতে বলবান অনেক ব্যায়ামবীর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত অমন সুগঠিত দেহ এবং অমন খোদাই করা মাংস পেশীর অধিকারী কেউ কি হতে পেরেছেন? আজও যদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেহী প্রতিযোগিতায় স্যাণ্ডো হঠাৎ এসে উদয় হন, কেউ কি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে? সে কথা কল্পনাই করা যায় না।

ইউজিন স্যাণ্ডো

স্যাণ্ডোকে ব্যায়াম-জগতে আধুনিকতার জনক বললে অত্যুক্তি করা হবে না। পোশাকের আড়ালে অমন আশ্চর্য বলিষ্ঠ চেহারা লুকিয়ে আছে জানতে পারলে ডিউক মশাই নিশ্চয়ই ওই হঠকারিতার পরিচয় দিতেন না। অত শক্তিধর হয়েও স্যাণ্ডো কিন্তু শক্তির অপচয় করা ব্যায়ামবিদদের পক্ষে অশোভন বলেই মনে করতেন, তাই দু-দুবার ডিউকের অপমানজনক ব্যবহার তিনি গায়ে মাখেননি। গুণী লোক-দের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে, তাই না?

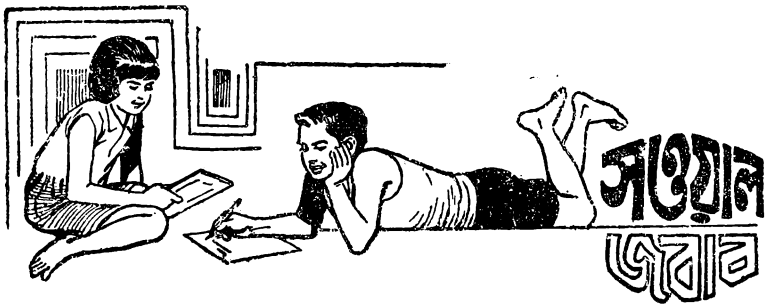

বাণী মৌলিক

দেবাশিস, প্রভাকর, হাম্বির, শিশুপাঠশালা, ধুবড়ী, আসাম
—এই পৃথিবীতে প্রথমে ডিম্বের সৃষ্টি হয়, না প্রাণের সৃষ্টি হয়? কিভাবেই বা হল?
ঃ কী কাণ্ড! শেষতক কিনা অণ্ড নিয়ে পড়লে! এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন অণ্ড কি কস্মিন কালেও থাকতে পারে, বিনা প্রাণে যা কিনা জন্ম নিতে পারে? এমন কি কুষ্মাণ্ড-দেরও প্রাণ না থাকলে চলে না। অশ্ব-ডিম্বের ব্যাপারটা অবশ্যি আলাদা। সুতরাং বুঝতে পারছো, তোমাদের সওয়ালটাই বেশ গণ্ডগুলে।

প্রাণ-সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদটা এবার সংক্ষেপে বলি। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি প্রায় শ'খানেক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী এই পৃথিবী। তার সেই শৈশবকালে এখানে কিছুই ছিল না—ছিল না স্থল, ছিল না জল, ছিল না কোন প্রাণের সাড়া। এমনি করে কেটে যায় অসংখ্য কোটি বছর। ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত ও ঠাণ্ডা হতে থাকে, নির্দিষ্ট রূপ বা আকার নেয় সে।

শেষে এল জল। জলময় নিষ্প্রাণ পৃথিবী তার পরেও মহাব্যোমে পাক খেয়ে চললো আরো কতকাল ধরে। তারপর এই জলে একদিন জাগলো প্রাণের সাড়া। প্রাণহীন জড় পদার্থের মধ্যে কিভাবে সেদিন প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল, তা জানা সম্ভব না হলেও একটা বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত যে, জীবন-সৃষ্টির জন্য যেসব মৌলিক উপাদান দরকার, যুগ-যুগান্ত ধরে সমুদ্রের এখানে ওখানে সেগুলির একত্র সমাবেশ ঘটছিল ধীরে ধীরে। আর কোন অগভীর উপ-সাগরে বা খাঁড়িতে বা জলমগ্ন পর্বত-কন্দরে সেই সব মৌলিক পদার্থের সমাবেশে হয়ত যুগ যুগ ধরে এসে পড়ছিল সূর্যের নিয়মিত আলো ও তাপ—ঠিক ততটুকুই, জীবনের উন্মেষ ঘটাতে ঠিক যেটুকু দরকার। আর তার পরেই—

বাজিল শঙ্খ, বাজে দুন্দুভি ভূলোক-দ্যুলোক জুড়িয়া,
জাগিয়া উঠিল প্রাণ
জাগিল ছন্দ মহাকাল-বুকে, জাগে রে নৃত্য-গান।

সুস্মিত ভট্টাচার্য, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
—সুপ্রিয় বাণীদি, সেদিন আমাদের ক্লাবের পিকনিক। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী এসে শুনলাম যে, প্রিয় বন্ধু কিশোর ভারতী এসেছে এবং যা দেখলাম তাতে খুব তাজ্জব বনে গেলাম। যে বড়দা কোন দিন কোন গল্পের বইয়ের পাতা ওলটায় না সে কিনা একেবারে পড়ার ঘরে দরজা দিয়ে এক-মনে কিশোর ভারতী পড়ছে! কি আর করব, জানলা দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে একটা ক্ষুদ্র ঝগড়া লাগিয়ে দিলাম। দাদাদের পড়া শেষ না হতেই স্কুলের মাস্টারমশাই, বাড়ীর মাস্টারমশাই এবং পাড়ার ছেলেরা কিশোর ভারতীর খোঁজ করেন। আচ্ছা বলুন তো আমি কখন পড়ব? কি মুশকিলেই না পড়েছি! সেজন্যে ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি বার করেছি। মে মাস পড়তেই একটা কাগজে "মে মাসের কিশোর ভারতী প্রথম তিন দিন আমার রিজার্ভড্" লিখে তলায় সই করে দিয়েছি। বুদ্ধিটা কেমন বলুন তো?
ঃ সে আর বলতে! মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য, তবে তোমার এ পাঁতি ওঁরা মানলে হয়। না মানলেও তোমার মুখের মিষ্টি হাসিটুকু যেন বজায় থাকে।
—গত ডিসেম্বর '৭২ সংখ্যার 'নন্টে আর ফন্টে'র পাত্তাই পাইনি। ওরা তখন নিশ্চয়ই পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিল। তাই না?
ঃ সাবাস! কি করে ধরলে?
—আমি কিশোর ভারতীর বন্ধুদের সঙ্গে পত্রবন্ধুত্ব করতে চাই। আমার বয়স ১৩ বৎসর, শখ ছবি আঁকা, গল্প ও কবিতা লেখা, মূকাভিনয় করা, ডাকটিকিট সংগ্রহ এবং খেলাধুলার খবর সংগ্রহ করা।
সুব্রত ভট্টাচার্য, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
—শ্রীচরণেষু বাণীদি, সর্বপ্রথমে আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি কিশোর ভারতীর মাধ্যমে পত্রবন্ধুত্ব করতে চাই। বয়স ১৬½ বছর, শখঃ ডাকটিকিট ও প্রথম দিবসীয় আবরণ সংগ্রহ করা, গল্প লেখা এবং গল্পের বই পড়া।
বিপ্লবকুমার ঘোষ, হালতু, চব্বিশ পরগনা
—বাণীদি, কিশোর ভারতীর শারদীয়া সংখ্যার জন্য রচনা পাঠাতে চাই। রচনা পাঠালে কি এখন গ্রহণীয় হবে? কোন্ ঠিকানায়? পাতার এপিঠ ওপিঠ লিখলে চলবে কি?
ঃ শারদীয়া কিশোর ভারতীর জন্যে রচনা এখনো পাঠানো যেতে পারে বই কি। পাঠাবার ঠিকানাঃ কিশোর ভারতী কার্যালয়, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯। রচনা এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে পাঠাতে হবে।
মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৩
—বাণীদি, আশা করি, ভালই আছেন। আপনার সওয়াল-জবাবগুলো পড়তে আমার খু-উ-উ-ব ভাল লাগে। কিন্তু আমার মনে একটা সংশয় জন্মেছে—আপনি বাণীদি, না

বাণীদা? কেউ আপনাকে 'দা' লেখে, কেউ আবার 'দি'।
ঃ কেউ বা 'মাসী'—যেমন গত সংখ্যায় লিখেছিল জয়পুর রাজার বাজার থেকে প্রদীপ্তকুমার নাথ। তাই বলে তুমিও আবার লিখতে যেও না যেন।
—আমার আঁকা ছবিটা কেমন?
ঃ খুবই ভাল, তবে আর কাউকে দেখাতে পারলাম না—এই যা দুঃখ।
—পত্রমিতালি করতে চাই। বয়স ১৫ বৎসর, শখ ছবি আঁকা আর গল্পের বই পড়া।
মৈত্রেয়ী বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৩
—পূজনীয়া বাণীদি, কিশোর ভারতীর যেন দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। প্রতিটি লেখা, প্রতিটি গল্প আমার এত ভাল লাগে যে কি বলব! আমার দিদির (মিঠু) চিঠি হয়তো পেয়ে থাকবেন। ওর সঙ্গে আমার খালি ঝগড়া হয় কার হাতের লেখা ভাল তাই নিয়ে। আপনি আশা করি, এর মীমাংসা করে দেবেন।
ঃ এ আর এমন শক্ত কি? দুটো চিঠিই তো একজনের লেখা—হয় তোমার, নয় তোমার দিদির। তোমার হলে তোমার হাতের লেখাই ভাল আর তোমার দিদির হলে মিঠুর, তাই না?
হিমাদ্রি ও নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁটালগুড়ি চা বাগান, জলপাইগুড়ি
—কিশোর ভারতীতে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কোন অপ্রকাশিত গল্প দেওয়া হয় না কেন?
ঃ থাকলে তো দেব! তাঁর সব গল্পই প্রকাশিত হয়ে গেছে মনে হয়। তোমাদের জন্য আর কিস্‌সু বাকি নেই।
—ময়ূখ চৌধুরী গল্প লিখলে সেই গল্পের ছবিগুলি কি প্রসাদ রায় এঁকে থাকেন? প্রসাদ রায় কি ময়ূখ চৌধুরীর কেউ হন?
ঃ ময়ূখ চৌধুরীর গল্পে বিভিন্ন শিল্পীই ছবি এঁকে থাকেন। এঁরা সকলেই ময়ূখবাবুর ঘনিষ্ঠ জন।
রঞ্জন পাল, বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া
—কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে 'নিজে করো' খুব কমই বেরোয়। প্রতি সংখ্যাতেই 'নিজে করো' থাকলে আমার কোন অভিযোগই থাকবে না।
ঃ সেরেছে! প্রতি সংখ্যায়? খবরটা কিশোর বিজ্ঞানীকে বেশ ঘায়েল করেছে। যাই হোক এ সংখ্যায় ওটা থাকছে। কিন্তু তারপর কি হবে? কিশোর বিজ্ঞানী হয়ত নিজেই নিজেকে অদৃশ্য করবে, দেখিয়ে দেবে 'নিজে করো' কাকে বলে!
—পত্রবন্ধু চাই। শখ ছবি তোলা, ভিউ কার্ড জমানো ও বেড়ানো। বয়স ১৬½ বৎসর।
চিত্রগুপ্ত, নড়িহা, পুরুলিয়া
—কিশোর ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশমান উপন্যাস 'সাদা ঘোড়ার সওয়ার' ও ছবিতে গল্প 'সংখ্যার নাম চার' দারুন ভাল লাগছে। প্রথমটির জন্য লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শিপলী নারায়ণ দেবনাথকে এবং দ্বিতীয়টির জন্য শিল্পী ময়ূখ চৌধুরীকে আমার অভিনন্দন জানাবেন।
ঃ স্বয়ং চিত্রগুপ্তের এই অভিনন্দনে ওঁরা নির্ঘাৎ বিলক্ষণ আনন্দিত হবেন।
সৌম্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বালুরমঠ, পশ্চিম দিনাজপুর
—কিশোর ভারতীর নতুন বিভাগ শৈলেনকুমার দত্তের 'মহাজীবনের মণিকণা' খু-উ-ব ভাল লাগছে। আশা করি, এই 'মণিকণা' তাড়াতাড়ি শেষ হবে না।
ঃ যদ্দিন মিলবে, তদ্দিন তো বটেই!
গৌতম সাহা, কলিকাতা ৩৩
—গত এপ্রিল মাসের কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত 'গুণ্ডা' খুব ভাল লেগেছে। লেখককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাবেন।
ঃ তথাস্তু। 'গুণ্ডা' তাহলে তোমাকেও ঘায়েল করেছে!
সুব্রতকুমার পাঠক, শালকিয়া, হাওড়া ৬
—পরমশ্রদ্ধেয়া বাণীদি, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি কিশোর ভারতীর একজন গুণমুগ্ধ নিয়মিত পাঠক। প্রতিমাসে কিশোর ভারতীর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকি, পাওয়ামাত্র একরকম আহার-নিদ্রা বর্জন করে পড়ে শেষ করে ফেলি। গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীধর সেনাপতির লেখা 'একটি অতিগোপনীয় মৃত্যু' পড়ে খুব ভাল লাগল, খুবই আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে তিনি আমাদের পাড়ারই একজন ডাক্তার। মনোরঞ্জন ঘোষের লেখা 'মৃত্যুর সন্ধানে' লেখাটিও খুব ভাল লেগেছে। তাঁদের আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। আচ্ছা, আন্তিলিও গত্তির অভিযান সংক্রান্ত যে গল্পগুলি ময়ূখ চৌধুরী অনুবাদ করেছেন, তাদের কোন্‌টি প্রথম কিশোর ভারতীর কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়?
ঃ আন্তিলিও গত্তির আফ্রিকা-অভিযানের প্রথম অভিজ্ঞতা 'কায়না' প্রকাশিত হয় গত শারদীয় সংখ্যায়।
পার্থ দত্ত, কলিকাতা ১২
—মোহাম্মদ নাসির আলীর গল্প আরো চাই। আচ্ছা, 'রহস্যময় সেই বাড়িটা'য় ব্ল্যাক ডায়মন্ড কি স্বয়ং.....?
ঃ হ্যাঁ।

আসন্ন ষষ্ঠ বর্ষের গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ৬৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥

শব্দ-ছক

[উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৮শে জুন, ১৯৭৩]

১ নির্বিরোধী	ভাল	৯ খাপে	খামে
২ অপবাদ	অপরাধ	১০ গরু	ঘোড়া
৩ ভয়হীন	বিনাশহীন	১১ সহকারীদের	সহযাত্রীদের
৪ লোভনীয়	সুন্দর	১২ দিয়ে	ক'রে
৫ থাকলেই	আঁকলেই	১৩ বৈচিত্র্য	বৈপরীত্য
৬ সন্তান	শিশু	১৪ লোভ	রুচি
৭ ডগা	ডাঁটা	১৫ দিব্যি	দাগ
৮ নিয়ে	খেয়ে	১৬ মৃত্যু	রক্ত

নাম.....

পুরো ঠিকানা.....

বয়স.....

আটটি সম্পূর্ণ উপন্যাস॥ এগারোটি উপন্যাসোপম বড় গল্প॥ ছবিতে সুদীর্ঘ ইতিহাস-নির্ভর গল্প ॥ রঙিন ছবিতে নন্টে আর ফন্টের গল্প ॥ ছবিতে রহস্য-রোমাঞ্চিত কাহিনী॥ ছবিতে অরণ্য॥ বাংলাদেশের গল্প॥ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদার গল্প ॥ অমর টেনিদার গল্প ॥ হর্ষবর্ধক হর্ষবর্ধনের গল্প ॥ গোয়েন্দা গল্প ॥ রহস্য-গল্প ॥ ভৌতিক গল্প ॥ বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প ॥ ইতিহাস-নির্ভর গল্প ॥ জল-স্থল-অন্তরীক্ষের গল্প ॥ হাসির গল্প ॥ করুণ রসের গল্প ॥ সামাজিক গল্প ॥ রূপকথা-উপকথা ॥ বোম্বেটে জলদস্যুর গল্প ॥ গুপ্তচরের গল্প ॥ যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের গল্প॥ দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প॥ জীবজগতের গল্প॥ মানবতার গল্প॥ বিশ্বসাহিত্যের গল্প ॥ প্রাচীন সাহিত্যের গল্প ॥ মিষ্টি গল্প ॥ রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী ॥ শিকার-কাহিনী ॥ মহাজীবনের গল্প ॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥ আবিষ্কারের গল্প ॥ ম্যাজিকের গল্প ॥ মুক্তি-সংগ্রামের গল্প ॥ আজব গল্প ॥ নাটক॥ ছড়া-নাটক॥ কাব্যনাট্য॥ ছড়া-কবিতা-লিমেরিক॥ ধাঁধা-হেঁয়ালি॥ বিজ্ঞানীর দপ্তর ॥ জাদুবিদ্যা ॥ ব্যায়াম ॥ সঙ্গীত ॥ খেলাধুলা ॥ গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর ॥ মহাজীবনের মণিকণা ॥ ইতিহাসের ভেলকি ॥ বইয়ের দুনিয়া ॥ যা জানি তা ॥ গল্পের জাদুঘরে ॥ টুকরো হাসি ॥ সংবাদ-বিচিত্রা ॥ রঙিন আর্টপ্লেট ॥ সওয়াল-জবাব ইত্যাদি নিয়ে মহাসমারোহে প্রস্তুতির পথে

শারদীয়া

কিশোর ভারতী ১৩৮০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে ● মূল্যঃ আনুমানিক ৮·০০

Postal Regd. No . C-79
N. P. Regd. No : R. N. 16599/68

কোথাও যা নেই, থাকছে এখানেই !

দুর্দান্ত 'অষ্টবজ্রসম্মেলন' !

অর্থাৎ

আহ্লাদে আটখানা হবার মতোই আটখানা সম্পূর্ণ উপন্যাস

অপরাজেয় কিশোর 'ভারতীয় একাদশ' !

সাদা কথায়

এগারোটি উপন্যাসোপম বড় গল্প

ভয়ঙ্কর ব্রহস্পর্শযোগ !

সোজা ভাষায়

তিন-তিনটি সুদীর্ঘ সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনী

অনবদ্য সেঞ্চুরী !

অস্যার্থ

শত লেখক-শিল্পীর মহাসমাবেশ

এবং

বা. ক্র. প্র.

অর্থাৎ

বাদবাকি ক্রমশঃ প্রকাশ্য

প্রস্তুতির পথে

আকারে মহাভারত-প্রমাণ, আস্বাদে অমৃত-সমান

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৮০

মূল্য : আনুমানিক ৮·০০